নেহেরু বাল পুস্তকালয়

এক গাড়ি গল্প

সম্পাদনা

অমিতাভ চৌধুরী

ছবি

সুবীর রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

খগম

সত্যজিৎ রায়

পেট্রোম্যাক্সের আলোতে বসে ডিনার খাচ্ছি, সবেমাত্র ডালনার ডিমে একটা কামড় দিয়েছি, এমন সময় চৌকিদার লছমন জিগ্যেস করল, 'আপলোগ ইমলি বাবাকো দর্শন নেহি করেঙ্গে?'

বলতে বাধ্য হলাম যে ইমলিবাবার নামটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন, তা দর্শন করার প্রশ্নটা ওঠেই নি। লছমন বলল জঙ্গল বিভাগের যে জীপটা আমাদের জন্য মোতায়েন হয়েছে তার ড্রাইভারকে বললেই সে আমাদের বাবার ডেরায় নিয়ে যাবে। জঙ্গলের ভিতরেই তার কুটির, ভারী মনোরম পরিবেশ, সাধু হিসাবেও নাকি খুব উঁচু স্তরের; ভারতবর্ষের নানান জায়গা থেকে গণ্যমান্য লোকেরা এসে তাঁকে দেখে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া আর যে ব্যাপারটা শুনে আরো কৌতূহল হল সেটা হল এই যে, বাবার নাকি একটা পোষা কেউটে আছে, সেটা বাবার কুটিরের কাছেই একটা গর্তে থাকে, আর রোজ সন্ধেবেলা গর্ত থেকে বেরিয়ে বাবার কাছে এসে ছাগলের দুধ খায়।

ধূর্জটিবাবু সব শুনেটুনে মন্তব্য করলেন যে দেশটা বুজরুকিতে ছেয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা দিন দিন বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। পশ্চিমে যতই বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়ছে, আমাদের দেশটা নাকি ততই আবার নতুন করে কুসংস্কারের অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে।— 'হোপ্‌লেস ব্যাপার মশাই। ভাবলে মাথায় রক্ত উঠে যায়।'

কথাটা বলে ধূর্জটিবাবু হাত থেকে কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে, পাশ থেকে

ফ্লাই-ফ্ল্যাপ বা মক্ষিকা-মারণ দণ্ডটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর এক অব্যর্থ চাপড়ে একটা মশা মেরে ফেললেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। বেঁটে রোগা ফরসা চোখাচোখা চেহারা, চোখ দুটো রীতিমতো কটা। আমার সঙ্গে আলাপ এই ভরতপুরে এসে। আমি এসেছি আগ্রা হয়ে, যাব জয়পুরে মেজদার কাছে দু হপ্তার ছুটি কাটাতে। এখানে এসে ডাক বাংলোয় বা টুরিস্ট লজে জায়গা না পেয়ে শেষটায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শহরের বাইরে এই ফরেস্ট রেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। তাতে অবিশ্যি আক্ষেপের কিছু নেই, কারণ জঙ্গলে ঘেরা রেস্ট হাউসে থাকার মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চকর আরাম আছে।

ধূর্জটিবাবু আমার একদিন আগে এসেছেন। কেন এসেছেন তা এখনো খুলে বলেন নি, যদিও নিছক বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কারণ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা দুজনে একই জীপে ঘোরাফেরা করছি। কাল এখান থেকে 22 মাইল পূবে দীগ বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম সেখানকার কেল্লা আর প্রাসাদ দেখতে। ভরতপুরের কেল্লাও আজ সকালে দেখা হয়ে গিয়েছে, আর বিকেলে গিয়েছিলাম কেওলাদেওয়ের ঝিলে পাখির আস্তানা দেখতে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সাত মাইলের উপর লম্বা ঝিল, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো ডাঙা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, আর সেই ডাঙার প্রত্যেকটিতে রাজ্যের পাখি এসে জড়ো হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি আমি কোনো কালে চোখেই দেখিনি। আমি অবাক হয়ে পাখি দেখছি, আর ধূর্জটিবাবু ক্ষণে ক্ষণে গজ গজ করে উঠছেন আর হাত দুটোকে অস্থিরভাবে এদিকে ওদিকে নাড়িয়ে মুখের আশপাশ থেকে উন্‌কি সরাবার চেষ্টা করছেন। উন্‌কি হল একরকম ছোট্ট পোকা। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মাথার চারপাশে ঘোরে আর নাকে মুখে বসে। তবে পোকাগুলো এতই ছোট যে তাদের অনায়াসে অগ্রাহ্য করে থাকা যায় ; কিন্তু ধূর্জটিবাবু দেখলাম বারবার বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এত অধৈর্য হলে কি চলে ?

সাড়ে আটটার সময় খাওয়া শেষ করে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চাঁদনি রাতে জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে ধূর্জটিবাবুকে বললাম, 'ওই যে সাধুবাবার কথা বলছিল— যাবেন নাকি দেখতে?'

ধূর্জটিবাবু তাঁর হাতের সিগারেটটা একটা ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়ির দিকে তাগ করে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'কেউটে পোষ মানে না, মানতে পারে না। সাপ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ছেলেবেলায় জলপাইগুড়িতে থাকতাম, নিজে হাতে অজস্র সাপ মেরেছি। কেউটে হচ্ছে বীভৎস শয়তান সাপ, পোষ মানানো অসম্ভব; কাজেই সাধুবাবার খবরটা কতটা সত্যি সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

আমি বললাম, 'কাল ত বিকেলে এমনিতে কোনো প্রোগ্রাম নেই, সকালে বায়ানের কেল্লা দেখে আসার পর থেকেই ত ফ্রি।'

'আপনার বুঝি সাধুসন্ন্যাসীদের ওপর খুব ভক্তি?' প্রশ্নটার পিছনে বেশ একটা খোঁচা রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি জবাবটা দিলাম খুব সরলভাবেই।

'ভক্তির কথা আর আসছে কী করে, কারণ সাধুসংসর্গের ত কোনো সুযোগই হয়নি এখন পর্যন্ত। তবে কৌতূহল যে আছে সেটা অস্বীকার করব না!'

'আমারও ছিল এককালে, কিন্তু একটা অভিজ্ঞতার পর থেকে আর...'

অভিজ্ঞতাটা হল—ধূর্জটিবাবুর নাকি ব্লাড প্রেসারের ব্যারাম, বছর দশেক আগে তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের পাল্লায় পড়ে তিনি এক সাধুবাবার দেওয়া টোট্‌কা ওষুধ খেয়ে নাকি সাতদিন ধরে অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন, আর তার ফলে তাঁর রক্তের চাপও নাকি গিয়েছিল বেড়ে। সেই থেকে ধূর্জটিবাবুর ধারণা হয়েছে ভারতবর্ষের শকতরা নব্বুই ভাগ সাধুই হচ্ছে আসলে ভণ্ড অসাধু।

ভদ্রলোকের বাবা-বিদ্বেষটা বেশ মজার লাগছিল, তাই তাঁকে খানিকটা উস্‌কোনোর জন্য বললাম, 'কেউটের পোষ মানার কথা যে বলছেন, আমি

আপনি পোষ মানাতে পারব না নিশ্চয়ই, কিন্তু হিমালয়ের কোনো কোনো সাধু ত শুনেছি একেবারে বাঘের গুহায় বাঘের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে।

'শুনেছেন ত, দেখেছেন কি?'

স্বীকার করতেই হল যে দেখিনি।

'দেখবেন না। এ হল আষাঢ়ে গপ্পোর দেশ। শুনবেন অনেক কিছুই, কিন্তু চাক্ষুস দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন না। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতই দেখুন না। বলছে ইতিহাস, কিন্তু আসলে আজগুবি গপ্পের ডিপো! রাবণের দশটা মাথা, হনুমান ল্যাজে আগুন নিয়ে লঙ্কা পুড়োচ্ছে, ভীমের অ্যাপিটাইট, ঘটোৎকচ, হিড়িম্বা, পুষ্পক রথ, কুম্ভকর্ণ—এগুলোর চেয়ে বেশি ননসেন্স আর কী আছে? আর সাধু সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামির কথা যদি বলেন সে ত এই সব পুরাণ থেকেই সুরু হয়েছে। অথচ সারা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকে অ্যাদ্দিন ধরে এই সব গিলে খাচ্ছে!'

বায়ানের কেল্লা দেখে রেস্ট হাউসে ফিরে লাঞ্চ ও বিশ্রাম সেরে ইমলিবাবার ডেরায় পৌঁছতে চারটে বেজে গেল। ধূর্জটিবাবু এ ব্যাপারে আর আপত্তি করেন নি। হয়ত তাঁর নিজেরও বাবা সম্পর্কে একটু কৌতূহল হচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে একটা দিব্যি পরিষ্কার খোলা জায়গায় একটা বিরাট তেঁতুল গাছের নীচে বাবার কুটির। গাছের থেকেই বাবার নামকরণ, আর সেটা করেছে স্থানীয় লোকেরা। বাবার আসল নাম কী তা কেউ জানেনা।

খেজুর পাতার ঘরে একটি মাত্র চেলা সঙ্গে নিয়ে ভাল্লুকের ছালের উপর বসে আছেন বাবা। চেলাটির বয়স অল্প, বাবার বয়স কত তা বোঝার জো নেই। সূর্য ডুবতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি, কিন্তু তেঁতুলপাতার ঘন ছাউনির জন্যে এ জায়গাটা এখনই বেশ অন্ধকার। কুটিরের সামনে ধুনি জ্বলছে, বাবার হাতে গাঁজার কলকে। ধুনির আলোতেই দেখলাম কুটিরের এক পাশে একটা দড়ি টাঙানো, তাতে একটা গামছা আর একটা কৌপীন ছাড়া ঝোলানো রয়েছে গোটা দশেক সাপের খোলস।

আমাদের দেখে বাবা কল্কের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ধূর্জটিবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'বৃথা সময় নষ্ট না করে আসল প্রসঙ্গে চলে যান। দুধ খাওয়ার সময়টা কখন জিগ্যেস করুন।'

আপ বালকিষণসে মিল্না চাহ্তে হেঁ?'

ইমলিবাবা আশ্চর্য উপায়ে আমাদের মনের কথা জেনে ফেলেছেন। কেউটের নাম যে বালকিষণ সেটা আমাদের জীপের ড্রাইভার দীনদয়াল কিছুক্ষণ আগেই বলেছেন। ইমলিবাবাকে বলতেই হল যে আমরা তাঁর সাপের কথা শুনেছি, এবং পোষা সাপের দুধ খাওয়া দেখতে আমাদের ভারি আগ্রহ। সে সৌভাগ্য হবে কি?

ইমলিবাবা আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বললেন, বালকিষণ রোজই সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাবার ডাক শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে কুটিরে এসে দুধ খেয়ে যায়, দুদিন আগে পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু গতকাল থেকে তার শরীরটা নাকি তেমন ভাল নেই। আজ পূর্ণিমা, আজও সে আসবে না। আসবে আবার কাল থেকে।

সাপের শরীর খারাপ হয় এ খবরটা আমার কাছে নতুন। তবে পোষা ত—হবে নাই বা কেন। গরু, ঘোড়া কুকুর ইত্যাদির জন্য ত হাসপাতালই আছে।

বাবার চেলা আরো একটা খবর দিল। একে ত শরীর খারাপ, তার পর কিছু কাঠ পিঁপড়ে নাকি তার গর্তে ঢুকে বালকিষণকে বেশ কাবু করে ফেলেছিল। সেই সব পিঁপড়ে নাকি বাবার অভিশাপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কথাটা শুনে ধূর্জটিবাবু আমার দিকে আড়চোখে চাইলেন। আমি কিন্তু ইমলিবাবার দিকেই দেখছিলাম। চেহারায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। পরণে সাধারণ একটা গেরুয়া আলখাল্লা। মাথায় জটা আছে, কিন্তু তাও তেমন জবড়জং কিছু নয়। দু কানে দুটো লোহার মাকড়ি, গলায় গোটা চারেক ছোট বড় মালা, ডান কনুইয়ের উপরে একটা তাবিজ। অন্য পাঁচটা সাধুবাবার সঙ্গে খুব একটা

তফাৎ নেই। কিন্তু তাও সন্ধ্যায় পড়ন্ত আলোয় ধুনির পিছনে বসা লোকটার দিক থেকে কেন জানি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে চেলাটি দুটো চাটাই বার করে এনে বাবার হাত দশেক দূরে বিছিয়ে দিল। কিন্তু বাবার পোষা কেউটেকেই যখন দেখা যাবে না তখন আর বসে কী হবে? বেশি দেরি করলে আবার ফিরতে রাত হয়ে যাবে। গাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা, আর আশেপাশে জন্তু জানোয়ারেরও অভাব নেই। হরিণের পাল ত রোজই দেখছি। তাই শেষ পর্যন্ত আর বসলাম না। বাবাকে নমস্কার করতে তিনি মুখ থেকে কল্‌কে না সরিয়ে চোখ বুজে মাথা হেঁট করে প্রতি-নমস্কার জানালেন। আমরা দুজনে শ খানেক গজ দূরে রাস্তার ধারে রাখা জীপের উদ্দেশে রওনা দিলাম। কিছু আগেও চারিদিকের গাছগুলো থেকে বাসায়-ফেরা পাখির কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম, এখন সব নিস্তব্ধ।

কুটির থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গিয়ে ধূর্জটিবাবু হঠাৎ থেমে বললেন, ‘সাপটা না হয় নাই দেখা গেল, তার গর্তটা অন্তত একবার দেখতে চাইলে হত না?’

আমি বললাম, ‘তার জন্যে ত ইমলিবাবার কাছে যাবার কোনো দরকার নেই, আমাদের ড্রাইভার দীনদয়াল ত বলছিল ও গর্তটা দেখেছে।’

‘ঠিক কথা।’

গাড়ি থেকে দীনদয়ালকে নিয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম। এবার কুটিরের দিকে না গিয়ে একটা বাদাম গাছের পাশ দিয়ে সরু পায়ে-হাঁটা পথ ধরে খানিকদূর এগিয়ে যেতেই সামনে একটা কাঁটাঝোপ পড়ল। আশেপাশে পাথরের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে মনে হল এককালে এখানে হয়ত একটা দালান জাতীয় কিছু ছিল। দীনদয়াল বলল, ওই ঝোপটার ঠিক পিছনেই নাকি সাপের গর্ত। এমনি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই কারণ আলো আরো কমে এসেছে। ধূর্জটিবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করে ঝোপের

উপর আলো ফেলতেই পিছনে গর্তটা দেখা গেল। যাক, গর্তটা তাহলে সত্যিই আছে। কিন্তু সাপ? সে কি আর অসুস্থ অবস্থায় আমাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য বাইরে বেরোবে? সত্যি বলতে কি, সাধুবাবার হাতে কেউটের দুধ খাওয়া দেখার বাসনা থাকলেও সেই কেউটের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দর্শন করার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ধূর্জটিবাবুর কৌতূহল দেখলাম আমার চেয়েও বেশি। আলোয় যখন কাজ হল না তখন ভদ্রলোক মাটি থেকে ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ঝোপের উপর ফেলতে আরম্ভ করলেন।

এই বাড়াবাড়িটা আমার ভালো লাগল না। বললাম, 'কী হল মশাই? আপনার দেখি রোখ চেপে গেছে। আপনি ত বিশ্বাসই করছিলেন না যে সাপ আছে।'

ভদ্রলোক এবার একটা বেশ বড় ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এখনো করছি না। এই ঢেলাতেও যদি ফল না হয় তাহলে বুঝব বাবাজী সম্বন্ধে এক স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প প্রচার করা হয়েছে। লোকের ভুল বিশ্বাস যত ভাঙানো যায় ততই মঙ্গল।'

ঢেলাটা একটা ভারি শব্দ করে ঝোপের উপর প'ড়ে কাঁটা সমেত পাতাগুলোকে তছনছ করে দিল। ধূর্জটিবাবু টর্চটা ধরে আছেন গর্তের উপর। কয়েক মুহূর্ত সব চুপ—কেবল বনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঝিঁঝিঁ সবেমাত্র ডাকতে আরম্ভ করেছে। এবার তার সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ হল। একটা শুকনো সুরহীন শিসের মতো শব্দ। তারপর পাতার খসখসানি, আর তারপর টর্চের আলোয় দেখা গেল একটা কালো মসৃণ জিনিসের খানিকটা। সেটা নড়ছে, সেটা জ্যান্ত, আর ক্রমেই সেটা গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এবার ঝোপের পাতা নড়ে উঠল, আর তার পরমুহূর্তেই তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা সাপের মাথা। টর্চের আলোয় দেখলাম কেউটের জ্বলজ্বলে চোখ, আর তার দু'ভাগে চেরা জিব, যেটা বার বার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে লিক্‌লিক্ করে আবার সুড়ুৎ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। দীনদয়াল কিছুক্ষণ

থেকেই জিপে ফিরে যাবার জন্য তাগাদা করছিল, এবার ধরা গলায় অনুনয়ের সুরে বলল, 'ছোড় দিজিয়ে বাবু!— আব্ তো দেখ লিয়া, আব্ ওয়াপস চলিয়ে।'

টর্চের আলোর জন্যই বোধহয় বালকিষণ এখনো মাথাটা বার করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করছে। আমি সাপ দেখেছি অনেক, কিন্তু এত কাছ থেকে এভাবে কালকেউটে কখনো দেখিনি। আর কেউটে আক্রমণের চেষ্টা না করে চুপচাপ চেয়ে রয়েছে এরকমও ত কখনো দেখিনি। হঠাৎ আলোটা কেঁপে উঠে সাপের উপর থেকে সরে গেল। তারপর যে কাণ্ডটা ঘটল সেটার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ধূর্জটিবাবু হঠাৎ একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে চোখের নিমেষে সেটা বালকিষণের মাথার দিকে তাগ করে ছুঁড়ে মারলেন। আর তারপরেই পর পর আরো দুটো। একটা বিশ্রী আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে আমি বলে উঠলাম, 'আপনি এটা কী করলেন ধূর্জটিবাবু!'

ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বেশ উল্লাসের সঙ্গেই বললেন, 'ওয়ান কেউটে লেস্।'

দীনদয়াল হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে ঝোপটার দিকে চেয়ে আছে। ধূর্জটিবাবুর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে আমিই এবার গর্তের উপর আলো ফেললাম। বালকিষণের অসাড় দেহের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ঝোপের পাতায় লেগে রয়েছে সাপের মাথা থেকে ছিট্‌কিয়ে বেরোন খানিকটা রক্ত।

এর মধ্যে কখন যে ইমলিবাবা আর তার চেলা এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারিনি। ধূর্জটিবাবুই প্রথম পিছন ফিরলেন। তারপর আমিও ঘুরে দেখি বাবা হাতে একটা যষ্টি নিয়ে আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেঁটে খেজুর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। বাবা যে এত লম্বা সেটা বসা অবস্থায় বুঝতে পারিনি। আর তাঁর চোখের চাহনির বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে

পারি যে, বিস্ময় ক্রোধ আর বিদ্বেষ মেশানো এমন চাহনি আমি কারো চোখে দেখিনি।

বাবার ডান হাতটা এবার সামনের দিকে উঠে এলো। এখন সেটা নির্দেশ করছে ধূর্জটিবাবুর দিকে। হাতের তর্জনীটা এবার সামনের দিকে বেরিয়ে এসে নির্দেশটা আরো স্পষ্ট হল। এই প্রথম দেখলাম বাবার আঙুলের এক একটা নখ প্রায় দু'ইঞ্চি লম্বা। কার কথা মনে পড়ছে বাবাকে দেখে? ছেলেবেলায় দেখা বীডন স্ট্রীটে আমার মামাবাড়ির দেয়ালে টাঙানো রবি বর্মার আঁকা একটা ছবি। দুর্বাসা মুনি অভিশাপ দিচ্ছেন শকুন্তলাকে। ঠিক এইভাবে হাত তোলা, চোখে ঠিক এই চাহনি।

কিন্তু অভিশাপের কথা কিছু বললেন না ইমলিবাবা। তাঁর গম্ভীর চাপা গলায় হিন্দীতে তিনি যা বললেন তার মানে হল—একটা বালকিষণ গেছে তাতে কী হল? আরেকটা আসবে। বালকিষণের মৃত্যু নেই। বালকিষণ অমর।

ধূর্জটিবাবু তাঁর ধুলো মাখা হাত রুমালে মুছে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চলুন।' বাবার চেলা এসে গর্তের মুখ থেকে কেউটের মৃতদেহটা বার করে নিল—বোধহয় তার সৎকারের ব্যবস্থার জন্য। সাপের দৈর্ঘ্য দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। কেউটে যে এত লম্বা হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ইমলিবাবা ধীরে ধীরে তাঁর কুটিরের দিকে চলে গেলেন। আমরা তিনজন গিয়ে জীপে উঠলাম।

রেস্ট হাউসে ফেরার পথে ধূর্জটিবাবুকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে তাঁকে একটা কথা না বলে পারলাম না। বললাম, 'সাপটা যখন লোকটার পোষা, আর আপনার কোন অনিষ্টও করছিল না, তখন ওটাকে মারতে গেলেন কেন?'

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক বুঝি সাপ আর সাধুদের আরো কিছু কড়া কথা শুনিয়ে নিজের কুকীর্তি সমর্থন করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তিনি সে সব কিছুই না করে উল্টে আমাকে একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রশ্ন করে বসলেন—

'খগম কে বলুন ত মশাই, খগম?'

খগম? নামটা আবছা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় শুনেছি বা পড়েছি মনে পড়ল না। ধূর্জটিবাবু আরো বার দু-এক আপন মনে খগম খগম করে শেষটায় চুপ করে গেলেন। রেস্ট হাউসে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। ইমলিবাবার চেহারাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ছে—দুর্বাসার মতো চোখ পাকিয়ে হাত তুলে রয়েছেন ধূর্জটিবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কেন যে এমন মতিভ্রম হল কে জানে। তবে মন বলছে, ঘটনার শেষ দেখে এসেছি আমরা, কাজেই ও নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। বাবা নিজেই বলেছেন বালকিষণের মৃত্যু নেই। ভরতপুরের জঙ্গলে কি আর কেউটে নেই? কালকের

মধ্যে নিশ্চয়ই বাবার চেলাচামুণ্ডারা আরেকটা কেউটে ধরে এনে বাবাকে উপহার দেবে।

ডিনারের লছমন মুরগীর কারি রেঁধেছিল, আর তার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা হাতের রুটি আর উরদকা ডাল। সারাদিনের ঘোরাফেরার পর খিদেটা দিব্যি হয়। কলকাতায় রাত্রে যা খাই তার ডবল খেয়ে ফেলি অক্লেশে। ধূর্জটিবাবু ছোটখাট মানুষ হলে কী হবে—তিনিও বেশ ভালোই খেতে পারেন। কিন্তু আজ যেন মনে হল ভদ্রলোকের খিদে নেই। শরীর খারাপ কিনা জিগ্যেস করাতে কিছু বললেন না। আমি বললাম, 'আপনি কি বালকিষণের কথা ভেবে আক্ষেপ করছেন?'

ধূর্জটিবাবু আমার কথায় মুখ খুললেন বটে, কিন্তু যা বললেন সেটাকে আমার প্রশ্নের উত্তর বলা চলে না। পেট্রোম্যাক্সের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গলাটাকে ভীষণ সরু আর মোলায়েম করে বললেন, 'সাপটা ফিস্‌ফিস্ করছিল...ফিস্‌ফিস্...করছিল...'

আমি হেসে বললাম, 'ফিস্‌ফিস্, না ফোঁশ ফোঁশ?'

ধূর্জটিবাবু আলোর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, ফিস্‌ফিস্।... সাপের ভাষা সাপের শিস, ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্...'

কথাটা বলে ভদ্রলোক নিজেই জিভের ফাঁক দিয়ে সাপের শিসের মতো শব্দ করলেন কয়েকবার। তারপর আবার ছড়া কাটার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'সাপের ভাষা সাপের শিস, ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্! বালকিষণের বিষম বিষ, ফিস্ ফিস্ ফিস্!...এটা কি? ছাগলের দুধ?'

শেষ কথাটা অবিশ্যি ছড়ার অংশ নয়। সেটা হল সামনে প্লেটে রাখা পুডিংকে উদ্দেশ্য করে।

লছমন শুধু দুধটা বুঝে ছাগল-টাগল না বুঝে বলল, 'হাঁ বাবু, দুধ হ্যায় আউর আণ্ডে ভি হ্যায়।'

দুধ আর ডিম দিয়ে যে পুডিং হয় সে কে না জানে?

ধূর্জটিবাবু লোকটা স্বভাবতই একটু খামখেয়ালি ও ছিটগ্রস্ত, কিন্তু ওঁর আজকের হাবভাবটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। তিনি নিজেই হয়ত সেটা বুঝতে পেরে যেন জোর করেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বড় বেশি রোদে ঘোরা হয়েছে ক'দিন, তাই বোধহয় মাথাটা...কাল থেকে একটু সাবধান হতে হবে।'

আজ শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে তাই খাবার পরে আর বাইরে না বসে ঘরে গিয়ে আমার সুটকেসটা গোছাতে লাগলাম। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে ভরতপুর ছাড়ব। মাঝরাত্তিরে সওয়াই মাধোপুরে চেঞ্জ, ভোর পাঁচটায় জয়পুর পৌঁছানো।

অন্তত এটাই ছিল আমার প্ল্যান। কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে গেল। মেজদাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিতে হল যে অনিবার্য কারণে যাওয়া একদিন পিছিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হল সেটাই এখন বলতে চলেছি। ঘটনাগুলো যথাসম্ভব স্পষ্ট ও অবিকলভাবে বলতে চেষ্টা করব। এ ঘটনা যে সকলে বিশ্বাস করবে না সেটা জানি। প্রমাণ যাতে হতে পারত, সে জিনিসটা ইমলিবাবার কুটিরের পঞ্চাশ হাত উত্তরে হয়ত এখনো মাটিতে পড়ে আছে। সেটার কথা ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে, কাজেই সেটা যে প্রমাণ হিসেবে হাতে করে তুলে নিয়ে আসতে পারিনি তাতে আর আশ্চর্য কী? যাক গে—এখন ঘটনায় আসা যাক।

সুটকেস গুছিয়ে, লণ্ঠনটাকে কমিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আড়ালে রেখে, রাতের পোষাক পরে বিছানায় উঠতে যাব, এমন সময় পূবদিকের দরজায় টোকা পড়ল। এই দরজার পিছনেই ধূর্জটিবাবুর ঘর।

দরজা খুলতেই ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'আপনার কাছে ফ্লিট জাতীয় কিছু আছে? কিম্বা মশা তাড়ানোর জন্য কোনো ওষুধ?'

আমি বললাম, 'মশা এলো কোত্থেকে? আপনার ঘরের দরজা জানালায় জাল দেওয়া নেই?'

'তা আছে।'

'তবে ?'

'তাও কী যেন কামড়াচ্ছে।'

'সেটা টের পাচ্ছেন আপনি ?'

'হাতে মুখে দাগ হয়ে যাচ্ছে।'

দরজায় মুখটায় অন্ধকার, তাই ভদ্রলোকের চেহারাটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'আসুন ভিতরে। দেখি কী দাগ হল।'

ধূর্জটিবাবু ঘরের ভিতরে এলেন। লণ্ঠনটা সামনে তুলে ধরতেই দাগগুলো দেখতে পেলাম। রুহিতন মার্কা কালসিটের মতো দাগ। এ জিনিস আগে কখনো দেখিনি, আর দেখে মোটেই ভালো লাগল না। বললাম, 'বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম বাঁধিয়েছেন। অ্যালার্জি থেকে হতে পারে। কাল সকালে উঠেই ডাক্তারের খোঁজ করতে হবে। আপনি বরং ঘুমোতে চেষ্টা করুন। ও নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আর এটা পোকার ব্যাপার নয়, অন্য কিছু ? যন্ত্রণা হচ্ছে কি ?'

'উঁহু।'

'তাও ভাল। যান, শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন, আর আমিও বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম। রাত্রে ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে বই বড়ার অভ্যাস, এখানে লণ্ঠনের আলোয় সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। আর সত্যি বলতে কি সেটার প্রয়োজনও নেই। সারাদিনের ক্লান্তির পর বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম এসে যায়।

কিন্তু আজ আর সেটা হল না। একটা গাড়ির শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। সাহেবের গলা শুনতে পাচ্ছি, আর একটা অচেনা কুকুরের ডাক। টুরিস্ট এসেছে রেস্ট হাউসে। কুকুরটা ধমক খেয়ে চেঁচানো থামাল। সাহেবরাও বোধহয় ঘরে ঢুকে পড়েছে। আবার সব নিস্তব্ধ। কেবল বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে! না, শুধু ঝিঁঝি না। তা ছাড়াও আরেকটা শব্দ পাচ্ছি। আমার পূবদিকের

প্রতিবেশী এখনো সজাগ। শুধু সজাগ নয়, সচল। তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। অথচ দরজার তলার ফাঁক দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি লণ্ঠনটা হয় নিভিয়ে দেওয়া হল, না হয় পাশের বাথরুমে রেখে আসা হল। অন্ধকার ঘরে ভদ্রলোক পায়চারি করছেন কেন?

এই প্রথম আমার সন্দেহ হল যে ভদ্রলোকের মাথায় হয়ত ছিটেরও একটু বেশি কিছু আছে। তার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দুদিনের। তিনি নিজে যা বলেছেন তার বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত, যাকে পাগলামো বলে তার কিন্তু কোনো লক্ষণ আমি ধূর্জটিবাবুর মধ্যে দেখিনি। দীগ আর বায়ানের কেল্লা দেখতে দেখতে তিনি যে ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন তাতে মনে হয় ইতিহাসটা তাঁর বেশ ভালোভাবেই পড়া আছে। শুধু তাই নয়। আর্ট সম্বন্ধেও যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে সেটার প্রমাণও তিনি তাঁর কথাবার্তায় দিয়েছেন। রাজস্থানের স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান কারিগরদের কাজের কথা তিনি রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলেন। নাঃ—ভদ্রলোকের শরীরটাই বোধহয় খারাপ হয়েছে। কাল একজন ডাক্তারের খোঁজ করা অবশ্য-কর্তব্য।

আমার ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে তখন বলছে পৌনে এগারটা। পূবের দরজায় আবার টোকা পড়ল। এবার বিছানা থেকে না উঠে একটা হাঁক দিলাম—

'কী ব্যাপার, ধূর্জটিবাবু?'

'শ্-শ্-শ্-শ্...'

'কী বলছেন?'

'শ্-শ্-শ্-শ্...'

বুঝলাম ভদ্রলোকের কথা আটকে গেছে। এত আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি! আবার বললাম, 'কী বলছেন ঠিক করে বলুন।'

'শ্-শ্-শ্-শুনবেন একটু?'

অগত্যা উঠলাম। দরজা খুলতে ভদ্রলোক এমন একটা ছেলেমানুষের মতো

প্রশ্ন করলেন যে আমার বেশ বিরক্তই লাগল।

'আচ্ছা স্-স্-স্-সাপ কি দন্ত্য স?'

আমি আমার বিরক্তি লুকোবার কোনো চেষ্টা করলাম না।

'আপনি এইটে জানবার জন্য এত রাত্রে দরজা ধাক্কালেন?'

'দন্ত্য স?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাপ মানে যখন সর্প, স্নেক, তখন দন্ত্য স।'

আর তালব্য শ?'

'সেটা অন্য শাপ। তার মানে—'

'—অভিশাপ?'

'হ্যাঁ, অভিশাপ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। শ্শ্শ্-শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমার একটু একটু মায়া হচ্ছিল। বললাম, 'আপনাকে বরং একটা ঘুমের ওষুধ দিই। ও জিনিসটা আছে আমার কাছে। খাবেন?'

'না। শ্শ্শ্-শীতকালে এমনিতেই ঘুমোই। শ্-শ্-শুধু স্-স্-সন্ধ্যায় স্-স্-সূর্যাস্তের স্-স্-সময়—'

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার জিভে কিছু হয়েছে নাকি? কথা আটকে যাচ্ছে কেন? আপনার টর্চটা একবার দিন ত।'

ভদ্রলোকের পিছন পিছন আমিও ওর ঘরে ঢুকলাম। টর্চটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ছিল। সেটা জ্বেলে ভদ্রলোকের মুখের সামনে ধরতেই তিনি হাঁ করে জিভটা বার করে দিলেন। জিভে কিছু যে একটা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটু সরু লাল ডগা থেকে সুরু করে জিভের মাঝখান পর্যন্ত চলে গেছে।

'এটাতেও কোনো যন্ত্রণা নেই বলছেন?'

'কই, না ত।'

কী যে ব্যারাম বাধিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক সেটা বোঝার সাধ্য নেই।

এবারে ভদ্রলোকের খাটের দিকে চোখ গেল। বিছানার পরিপাটি ভাব দেখে বুঝলাম তিনি এখনো পর্যন্ত খাটে ওঠেননি। বেশ কড়া সুরে বললাম, 'আপনাকে শুতে দেখে তারপর আমি নিজের ঘরে যাবো। আর জোর হাত করে অনুরোধ করছি আর দরজা ধাক্কাবেন না। কাল ট্রেনে ঘুম হবে না জানি, তাই আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নিতে চাই।'

ভদ্রলোক কিন্তু খাটের দিকে যাবার কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। লণ্ঠনটা বাথরুমে রাখা হয়েছে, তাই ঘরে প্রায় আলো নেই বললেই চলে। বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ ; উত্তরের জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, তারই প্রতিফলিত আলোয় ধূর্জটিবাবুকে দেখতে পাচ্ছি। স্লিপিং সুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছেন। আমি আসবার সময় কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে এসেছি, অথচ ধূর্জটিবাবু দিব্যি গরমটরম কিচ্ছু না পরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক শেষটায় যদি সত্যিই একটা গোলমেলে ব্যারাম বাধিয়ে বসেন তাহলে ত তাকে ফেলে আমার পক্ষে যাওয়াও মুশকিল হবে। বিদেশে বিভূঁইয়ে একজন বাঙালী বিপদে পড়লে আরেকজন তার জন্য কিছু না করে সরে পড়বে এ তো হতে পারে না।

আরেকবার তাকে বিছানায় শুতে বলেও কোনো ফল হল না। তখন বুঝলাম ওঁর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে জোর করে শুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। তিনি যদি অবাধ্য শিশু হতে চান, আমাকে তাঁর গুরুজনের ভূমিকা নিতেই হবে।

কিন্তু তাঁর হাতটা ধরা মাত্র আমার শরীরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া হল যে আমি চমকে তিন হাত পিছিয়ে গেলাম।

ধূর্জটিবাবুর শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। জ্যান্ত মানুষের শরীর এত ঠাণ্ডা হতে পারে এ আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

আমার অবস্থা দেখেই বোধহয় ধূর্জটিবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ভাব ফুটে উঠল। তাঁর কটা চোখ দিয়ে তিনি এখন আমার দিকে চেয়ে মিচকি মিচকি হাসছেন। আমি ধরা গলায় বললাম, 'আপনার কী হয়েছে বলুন ত?'

ধূর্জটিবাবু আমার দিক থেকে চোখ সরালেন না। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রায় মিনিট খানেক ধরে। অবাক হয়ে দেখলাম যে একটিবারও তাঁর চোখের পাতা পড়ল না। এরই মধ্যে তাঁর জিভটা বার কয়েক ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে

বেরোল। তারপর তিনি ফিস্‌ফিস্‌ গলায় বললেন, 'বাবা ডাকছেন—বালকিষণ। বালকিষণ....বাবা ডাকছেন....'

তারপর ভদ্রলোকের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। তিনি প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর করে নিজেকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে খাটের তলায় অন্ধকারে চলে গেলেন।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, হাত পা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ভদ্রলোক সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে এখন যেটা অনুভব করছি সেটা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক মেশানো একটা অদ্ভুত ভয়াবহ ভাব।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর কাঁপুনিটা কমল, চিন্তাটা একটু পরিষ্কার হল। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং চোখের সামনে যা ঘটতে দেখেছি তা থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় সেটা একবার ভেবে দেখলাম। আজ বিকেলে আমার সামনে ধূর্জটিবাবু ইমলিবাবার পোষা কেউটেকে পাথরের ঘায়ে মেরে ফেললেন। তারপরেই ইমলিবাবা ধূর্জটিবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—একটা বালকিষণ গেছে, তার জায়গায় আরেকটা বালকিষণ আসবে। সেই দ্বিতীয় বালকিষণ কি সাপ, না মানুষ?

নাকি সাপ-হয়ে-যাওয়া মানুষ?

ধূর্জটিবাবুর সর্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগগুলো কী?

জিভের দাগটা কী?

সেটা কি দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার আগের অবস্থা?

তাঁর শরীর এত ঠাণ্ডা কেন?

তিনি খাটে না শুয়ে খাটের তলায় ঢুকলেন কেন?

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা জিনিস মনে পড়ে গেল। খগম! ধূর্জটিবাবু জিগ্যেস করছিলেন খগমের কথা। নামটা চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি। এখন মনে পড়ে গেছে। ছেলেবেলায় পড়া মহাভারতের একটা গল্প। খগম নামে এক তপস্বী ছিলেন। তাঁর শাপে তাঁর বন্ধু সহস্রপাদ মুনি ঢোঁড়া সাপ হয়ে যান। খগম—সাপ—শাপ...সব মিলে যাচ্ছে। তবে তিনি হয়েছিলেন ঢোঁড়া, আর ইনি কী— ?

আমার দরজায় আবার কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। উপর দিকে নয়, তলার দিকে। চৌকাঠের ঠিক উপরে। একবার দুবার, তিনবার। আমি বিছানা থেকে নড়লাম না। দরজা আমি খুলব না। আর না!

আওয়াজ বন্ধ হল। আমি দম বন্ধ করে কান পেতে আছি। এবার কানে এল শিসের শব্দ। দরজার কাছ থেকে ক্রমে সেটা দূরে সরে গেল। এবার আমার নিজের হৃৎস্পন্দন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ওটা কী? একটা চিঁচিঁ শব্দ। একটা তীক্ষ্ণ মিহি আর্তনাদ। ইঁদুর নাকি? এখানে ইঁদুর আছে। প্রথম রাত্রেই দেখেছি আমার ঘরে। পরদিন লছমনকে বলাতে সে রান্নাঘর থেকে একটা ইঁদুর-ধরা কলে জ্যান্ত ইঁদুর দেখিয়ে নিয়ে গেল। বলল, 'চুহা ত আছেই, ছুছুন্দরও আছে।'

আর্তনাদ ক্রমে মিলিয়ে এসে আবার নিস্তব্ধতা। দশ মিনিট গেল। ঘড়ি দেখলাম। পৌনে একটা। ঘুম যে কোথায় উধাও হয়েছে জানি না। জানালা দিয়ে বাইরের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চাঁদ বোধ হয় ঠিক মাথার উপরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ। পাশের ঘরে ধূর্জটিবাবু বারান্দায় যাবার দরজাটা খুলেছেন। আমার ঘরের যেদিকে জানালা বারান্দায় যাবার দরজাও সেইদিকে। ধূর্জটিবাবুর ঘরেও তাই। বারান্দা থেকে নেমে বিশ হাত গেলেই গাছপালা সুরু হয়।

ধূর্জটিবাবু বারান্দায় বেরিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছেন তিনি? কী মতলব তাঁর? আমি এক দৃষ্টে জানালার দিকে চেয়ে রইলাম।

শিসের শব্দ পাচ্ছি। সেটা ক্রমশঃ বাড়ছে। এবার সেটা ঠিক আমার জানালার বাইরে। জানালাটা ভাগ্যিস জালে ঢাকা, নইলে....

একটা কী যেন জিনিস জানালার তলার দিক থেকে ওপরে উঠছে।

খানিকটা উঠে থেমে গেল। একটা মাথা। লণ্ঠনের আবছা আলোয় দুটো জ্বলজ্বলে কটা চোখ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে আছে।

প্রায় মিনিট খানেক এইভাবে থাকার পর একটা কুকুরের ডাক শোনা মাত্র মাথাটা বাঁ দিকে ঘুরে পরক্ষণেই আবার নীচের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুকুরটা ডাকছে। পরিত্রাহি চীৎকার। এবার একটা ঘুম-জড়ানো সাহেবী গলায় ধমকের আওয়াজ পেলাম। একটা কাতর গোঙানির সঙ্গে কুকুরের ডাকটা থেমে গেল। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। আমি মিনিট দশেক ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে শুয়ে রইলাম। কানের মধ্যে আজই রাত্রে শোনা একটা ছড়া বার বার ফিরে ফিরে আসছে—

সাপের ভাষা সাপের শিস
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্!
বালকিষণের বিষম বিষ
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্!

ক্রমে সেই ছড়াটাও মিলিয়ে এলো। বুঝতে পারলাম একটা ঝিমঝিমে অবসন্ন ভাব আমাকে ঘুমের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমটা ভাঙল সাহেবদের চেঁচামেচিতে। ঘড়িতে দেখি ছ'টা বাজতে দশ। কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গায়ে একটা গরম কাপড় চাপিয়ে বাইরে এসে শেতাঙ্গ আগন্তকদের সাক্ষাৎ পেলাম। দুই যুবক, আমেরিকান—ডাক নাম ব্রুস আর মাইকেল—তাদের পোষা কুকুরটা কাল রাত্রে মারা গেছে। কুকুরটাকে নিজেদের ঘরেই নিয়ে শুয়েছিল, তবে ঘরের দরজা বন্ধ করেননি। ওরা সন্দেহ করছে রাত্রে বিছে বা সাপ জাতীয় বিষাক্ত

কিছু এসে কামড়ানোর ফলে এই দশা। মাইকেলের ধারণা কাঁকড়া বিছে, কারণ শীতকালে সাপ বেরোয় না সেটা সকলেই জানে।

আমি আর কুকুরের উপর সময় নষ্ট না করে বারান্দার উল্টো দিকে ধূর্জটিবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। দরজা খোলা রয়েছে, ঘরের মালিক ঘরে নেই। লছমন রোজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল গরম করে। তাকে জিগ্যেস করতে সে বলল ধূর্জটিবাবুকে দেখেনি।

নানারকম আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে করে হোক ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতেই হবে। পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাবেন তিনি। কিন্তু চার পাশের জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

সাড়ে দশটায় জীপ এলো। আমি ড্রাইভারকে বললাম, পোস্ট অফিস যাব—জয়পুরে টেলিগ্রাম করতে হবে। ধূর্জটিবাবুর রহস্য সমাধান না করে ভরতপুর ছাড়া যাবে না।'

মেজদাকে টেলিগ্রাম করে, ট্রেনের টিকিট একদিন পিছিয়ে, রেস্ট হাউসে ফিরে এসে শুনলাম তখনও পর্যন্ত ধূর্জটিবাবুর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আমেরিকান দুটি তাদের মরা কুকুরটাকে কবর দিয়ে এরই মধ্যে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে উধাও।

সারা দুপুর রেস্ট হাউসের আশে পাশে ঘোরাফেরা করলাম। জীপটা আমার আদেশ মতোই আবার বিকেলে এসে হাজির হল। একটা মতলব ছিল মাথায়; মন বলছিল সেটায় হয়ত ফল হবে। ড্রাইভারকে বললাম, 'ইমলিবাবার কাছে চল।'

কাল যেমন সময় এসেছিলাম, আজও প্রায় সেই একই সময় গিয়ে পৌঁছলাম বাবার কুটিরে। বাবা কালকের মতো ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শিষ্য আজ আরো দুটি বেড়েছে, তার মধ্যে একজন মাঝবয়সী, অন্যটি ছোকরা।

বাবা আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নমস্কার জানালেন। কালকের সেই

ভস্মকরা চাহনির সঙ্গে আজকের চাহনির কোন মিল নেই। আমি আর সময় নষ্ট না করে বাবাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, আমার সঙ্গে কাল যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর কোনো খবর তিনি দিতে পারেন কিনা। বাবার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। বললেন, খবর আছে বৈকি, তোমার দোস্ত আমার আশা পূর্ণ করেছে, সে আমার বালকিষণকে আবার ফিরিয়ে এনেছে।

এই প্রথম চোখে পড়ল বাবার ডান পাশে রাখা রয়েছে একটা পাথরের বাটি। সেই বাটিতে যে সাদা তরল পদার্থটা রয়েছে সেটা দুধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সাপ আর দুধের বাটি দেখতে ত আর আমি এতদূর আসিনি। আমি এসেছি ধূর্জটিপ্রসাদ বসুর খোঁজে। লোকটা ত আর হাওয়ায় মিশে যেতে পারে না। তার অস্তিত্বের একটা চিহ্নও যদি দেখতে পেতাম তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

ইমলিবাবা মানুষের মনের কথা বুঝে ফেলতে পারেন এটা আগেও দেখেছি। গাঁজার কলকেতে বড় রকম একটা টান দিয়ে সেটা পাশের প্রৌঢ় চেলার হাতে চালান দিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুকে ত তুমি আর আগের মতো ফিরে পাবে না, তবে তার স্মৃতিচিহ্ন সে রেখে গেছে। সেটা তুমি বালকিষণের ডেরার পঞ্চাশ পা দক্ষিণে পাবে। সাবধানে যেও, অনেক কাঁটাগাছ পড়বে পথে।'

বাবার কথা মতো গেলাম বালকিষণের গর্তের কাছে। সে গর্তে এখন সাপ আছে কিনা সেটা জানার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আকাশে ডুবু ডুবু সূর্যের দিকে চেয়ে হিসেব করে দক্ষিণ দিক ধরে এগিয়ে গেলাম। ঘাস, কাঁটাঝোঁপ, পাথরের টুকরো আর চোরকাঁটার ভেতর দিয়ে গুণে গুণে পঞ্চাশ পা এগিয়ে গিয়ে একটা অর্জুন গাছের গুঁড়ির ধারে যে জিনিসটা পড়ে থাকতে দেখলাম, সেরকম জিনিস এই কয়েক মিনিট আগেই ইমলিবাবার কুটিরে দড়ি থেকে ঝুলছে দেখে এসেছি।

সেটা একটা খোলস। সারা খোলসের উপর রুহিতন মার্কা নকসা।

সাপের খোলস কি? না, তা নয়। সাপের শরীর কি এত চওড়া হয়? আর তার দুপাশ দিয়ে কি দুটো হাত, আর তলা দিয়ে কি এক জোড়া পা বেরোয়?

আসলে এটা একটা মানুষের খোলস। সেই মানুষটা এখন আর মানুষ নেই। সে এখন ওই গর্তটার মধ্যে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে জাতে কেউটে, তার দাঁতে বিষ।

ওই যে তার শিস শুরু হল। ওই যে সূর্য ডুবল। ওই যে ইমলিবাবা ডাকছে—'বালকিষণ....বালকিষণ....বালকিষণ....'

□

জ্যান্ত খেলনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বারান্দায় বসে গল্প করছিল সবাই, এমন সময় দীপু ছুটতে ছুটতে সেখানে এলো। তার হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল। দীপুর মুখ চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। যেন সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে একটা নতুন কিছু। শুকনো ডালটা উঁচু করে তুলে সে চেঁচিয়ে বললো, মা, দেখো, কী সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি।

বড়রা গল্প থামিয়ে তাকালো দীপুর দিকে। তার হাতে শুধুই একটা শুকনো গাছের ডাল। সুন্দর কিছু না। মা বললেন, দীপু, আবার একলা একলা বাগানে গিয়েছিলে? বাবা বললেন, সেইজন্যই অনেকক্ষণ দীপুকে দেখতে পাইনি!

বাড়ির পেছনেই বেশ বড় বাগান। বাগান মানে শুধু ফুলগাছের বাগান নয়। বড় বড় আমগাছ আর নারকোল গাছে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। আরও অনেক রকম গাছ আছে। কেউ যত্ন করে না। আগাছা জন্মে গেছে মাটিতে। বাগানের মধ্যে একটা পুকুরও আছে, সেটাও কচুরি পানায় ভর্তি।

দীপুর বড় মামাদের এই গ্রামের বাড়িতে এখন আর বিশেষ কেউ থাকে না। এবার দীপুরা সবাই বেড়াতে এসেছে। বড়মামা বললেন, ও বাগানে খেলুক না। ভয় তো কিছু নেই। মা বললেন, যদি সাপ-টাপ থাকে। বড় মামা বললেন, তোর কি বুদ্ধি। শীতকালে বুঝি সাপ বেরোয়?

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন, তা হোক। এই দুপুর বেলা বাগানে একলা একলা থাকা ভালো নয়। একটা পুকুর আছে, যদি পড়ে টড়ে যায়। দীপু তাড়াতাড়ি বললো, না, আমি পুকুরের কাছে যাইনি। বাবার

বন্ধু অমলকাকু এক পাশে বসে চুরুট টানছিলেন। তিনি বললেন, দীপু, তুমি কী সুন্দর জিনিস এনেছো? দীপু গাছের ডালটা এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন অমলকাকু, এটা খুব সুন্দর না? আমি আগে আর এরকম একটাও পাইনি! বাবা বললেন, এটার মধ্যে আবার সুন্দর কি আছে?

একটা এক হাত প্রায় লম্বা আমগাছের ডাল। ওপরের দিকে কয়েকটা শুকনো পাতা তখনো আছে, মাঝখান দিয়ে আবার দু'দিকে দুটো শুকনো ডাল বেরিয়েছে। দীপু বললো, দেখুন, দেখুন, এটা ঠিক মানুষের মতন দেখতে না?

অমলকাকু বললেন, তাই নাকি! দীপু জোর দিয়ে বললো, দেখতে পাচ্ছেন না? অবিকল ছোটমামার মতন!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো এক সঙ্গে। শুধু দীপুর ছোটমামা হাসতে পারলেন না! ছোটমামার চেহারাটা রোগা আর লম্বা, মাঝে মাঝে ওপরের দিকে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙেন। তাঁর চেহারা সম্পর্কে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যান।

অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, ঠিকই বলেছে কিন্তু! এ ছেলে দেখছি বড় হলে নির্ঘাৎ আর্টিস্ট হবে! মা বললেন, আর্টিস্ট হবে না ছাই। এই এক অদ্ভুত খেলা আছে ছেলেটার! অমলকাকু ছোটমামাকে আরও রাগাবার জন্য বললেন, কিন্তু যাই বলো তোমরা, আমি কিন্তু খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। ছোটমামা মনের ভুলে ঠিক সেই সময়েই আড়মোড়া ভাঙার জন্য হাত দুটো উঁচু করলেন। সবাই হেসে উঠলো আবার। দীপু বললো, মা, আমি কিন্তু এটা নিয়ে যাবো বাড়িতে। আর কিছু না বলে দীপু লাফাতে লাফাতে চলে গেল তার ঘরের দিকে। মা বললেন, ছেলেটা যত রাজ্যের জঞ্জাল এনে জমাচ্ছে ঘরে! এই সব নাকি আবার নিয়ে যেতে হবে! বাবা বললেন, কালকে একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে এনে বলেছিল সেটাকে নাকি দেখতে একেবারে জগন্নাথের মতন। অমলকাকু বললেন, ভুল তো বলেনি তাহলে। দারু ভুতে মুরারি। মা বললেন, কেন, সেই যে আর একটা কঞ্চি এনে একবার বলেছিল সেটা ওর ঠাকুরমা! এ সব গল্প করতে করতে বড়রা আবার বড়দের গল্পে ফিরে গেলেন।

আর কোন ছোট ছেলেমেয়ে নেই বলে এখানে দীপুকে খেলা করতে হয় একলা একলা। মা বারণ করলেও সে টুক টুক করে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যায় বাগানে। সে যে পুকুরটার কাছে নেমে একবার জলে পা দিয়ে এসেছে, মা সে কথাও জানেন না।

বাগানটা খুব ঠাণ্ডা। এত সব বড় বড় গাছ, তাদের ডালে পাতায় হাওয়া লেগে লেগে কত রকম সব মিষ্টি মিষ্টি শব্দ হয়। দীপুর মনে হয়, গাছগুলো সব যেন বেশ মানুষ, সবাই তাকে দেখেছে। পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে কি যেন

কথা বলতে চাইছে তার সঙ্গে। অনেক রকম পাখিও আছে এখানে। পাখিদের সঙ্গে গাছদের খুব ভাব, কখনও ওরা ঝগড়া করে না। পাখিগুলো সব সময় ব্যস্ত। হয় ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে কিংবা বসে বসে ডাকছে। একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরে কুং কুং কুং করে ডাকে, সেটাকে কিছুতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে বড় আমগাছটার নীচে দুটো ছোট্ট গাছ। দীপুরই সমান লম্বা। দীপু ওদের নাম দিয়েছে অরিজিৎ আর সুমন্ত্র। ঐ নামে দীপুর ইস্কুলের দুজন বন্ধু আছে। গাছ দুটোকে দীপু ঐ নাম দিয়ে ওদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে খেলা করে।

দীপু তাদের বলে, কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর শুনলাম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে বাইরে। আমি মাকে ডাকিনি, বাবাকেও ডাকিনি। ভাবলুম কি, নিজেই একলা একলা বাইরে গিয়ে দেখবো। একটুও ভয় পাইনি, সত্যি! যেই খাট থেকে নেমেছি, অমনি শব্দটা থেমে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, একটা বেড়াল! আমাকে দেখেই পালালো। ওটা কিন্তু আসলে বেড়াল নয়। নিশ্চয়ই মিশমিদের সর্দার এসেছিল, সেই যে ইচ্ছে করলেই অন্যরকম চেহারা নিতে পারে—আমাকে দেখেই বেড়াল হয়ে গেল, বুঝলি ?

এইরকম গল্প করতে করতেই দীপুর সময় কেটে যায়। মাঝে মাঝে দু' একটা প্রজাপতি এসে বসে সেই ছোট্ট গাছ দুটোতে তখন দীপু কথা থামিয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে। একটা প্রজাপতির নাম সে দিয়েছে বাবুই। ওটা তার মাসতুতো বোনের নাম।

একবার দীপু দেখলো অরিজিৎ নামের গাছটার গা বেয়ে বেয়ে একটা শুঁয়োপোকা উঠছে। দীপু খুব রেগে গেল সেটা দেখে। সে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুমি আমার বন্ধুর গায়ে উঠছো কেন ? শিগ্‌গির নামো!

শুঁয়োপোকাটা এমন পাজি যে কোন কথাই শোনে না। দীপু তখন একটা

কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। শুঁয়োপোকাটার নাম দেয় সে কুম্ভকর্ণ, তারপর অনেকক্ষণ ধরে সেটার সঙ্গে লড়াই করে। সেটাকে হারিয়ে দিয়ে দীপু আবার বাড়িতে ফিরে আসে মাকে খবরটা জানাবার জন্য।

দীপুর মামাবাড়ির গ্রামের খুব কাছেই বক্রেশ্বর। সেখানে গরম জলের ফোয়ারা আছে। পরের দিন সবাই সেখানে বেড়াতে যাবে। দীপু যেতে চায় না। তার বেশী ভালো লাগে ঐ বাগানে খেলা করতে। কিন্তু দীপুকে একা রেখে যেতে মা রাজি হলেন না। দীপুকে যেতেই হলো। গিয়ে অবশ্য একটা লাভ হলো। সেখানে দীপু একটা পাথরের টুকরো পেয়ে গেল, সেটাকে দেখতে একদম সুতপা মাসীর মতন। ঠিক সেই রকম হাসি হাসি মুখ। পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে এলো দীপু।

সাতদিন কেটে যাবার পর, এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। বাবার আপিসের আর ছুটি নেই। ফেরা হবে বড়মামার গাড়িতে। মালপত্তরে একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে গাড়ি। সবাই এক বস্তা করে নারকোল নিয়েছে। তার ওপরে আবার ঝুড়ি ঝুড়ি পাটালি গুড়। এর ওপর আছে আবার দীপুর নিজের জিনিস। সাতটা গাছের ডাল, তিনটে কঞ্চি আর চারখানা পাথরের টুকরো। বড়দের সব জিনিসপত্তর ঠিক ঠিক তোলা হলো, শুধু দীপুর জিনিসগুলো নেবার বেলাতেই গাড়িতে জায়গা কম পড়ে যায়।

বাবা বললেন, এই সব আজে বাজে জিনিসগুলো নিয়ে কি করবি! ওগুলো ফেলে দে! দীপু কিছুতেই রাজি নয়। এগুলো তার খেলার জিনিস, সে কিছুতেই ফেলে যাবে না। দীপু প্রায় কেঁদে ফেলছে দেখে মা বললেন, যাক গে, নিতে চাইছে যখন নিয়ে যাক!

গাছের ডালগুলো রাখা হলো গাড়ির মাথায় ক্যারিয়ারে, বিছানাপত্তরের পাশে। পাথরগুলো দীপু নিজের পায়ের কাছে রাখলো।

দীপুর ছোটমামা শুধু থেকে গেলেন, তিনি আর ক'দিন পরে একা ফিরবেন। আর সবাই উঠে পড়লো গাড়িতে। অমলকাকু বসেছেন দীপুর ঠিক পাশেই।

পাথরগুলোতে পা লাগায় অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, এই পাথরগুলো নিয়ে গিয়ে কি হবে দীপু? এরকম পাথর তো সব জায়গাতেই পাওয়া যায়!

দীপু বললো, না, মোটেই না। এই দেখুন না, এই পাথরটাকে দেখতে ঠিক ক্যাপ্টেন হ্যাডকের মতন।

অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাডক কে?

দীপু বললো, সে আছে একজন আমার গল্পের বইতে।

অমলকাকু আর একটা পাথর তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর এইটা?

—এটা তো সুতপা মাসী!

—তাই নাকি? তাহলে ওটা?

দীপু মুচকি হেসে বললো, অমলকাকু, আপনার মতন দেখতেও একটা পাথর পেয়েছি।

অমলকাকু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তাই নাকি? কই দেখি দেখি!

দীপু একটা বিশ্রী দেখতে পাথর তুলে দিল। অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, আরে তাই তো এটা তো ঠিক আমার মতন অবিকল দেখতে!

সবাই দারুণ হাসতে লাগলো। বড়মামা গাড়ি চালাতে চালাতে এমন হাসতে লাগলেন যে আর একটু হলে গাড়িটা রাস্তার পাশে গড়িয়ে যেত। কেউই কিন্তু পাথরটার সঙ্গে অমলকাকুর মুখের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না!

বাবা বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল! কি যে ওর খেলা!

অমলকাকু বললেন, না না, পাগল কেন হবে? আর্টিস্টরা এরকম অনেক কিছু দেখতে পায়, আমরা সাধারণ লোকরা তা পাই না!

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর অমলকাকুর চা খেতে ইচ্ছে হলো। গাড়ি থামানো হলো সেইজন্য। চায়ের দোকানের কাছে সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। অন্যদের হাতে চায়ের কাপ, দীপু নিয়েছে বোতলের সরবৎ।

সেখানে একজন মেয়ে কতগুলো বড় বড় রং করা বেতের ঝুড়ি বিক্রি করছিল। অমনি মায়ের একটা পছন্দ হয়ে গেল। যে কোন জায়গা থেকে

জিনিস কেনা মায়ের স্বভাব। কিন্তু অতবড় ঝুড়িটা নেওয়া হবে কোথায়? গাড়ির মাথাতেই বেঁধে নিতে হবে। বাবা আর অমলকাকু সেটা বাঁধাবাঁধি করছেন, হঠাৎ দীপু চিৎকার করে ছুটে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, একি কি করলে? ছোটমামার হাতটা যে ভেঙে গেল! সবাই অবাক হয়ে থমকে গেল। চায়ের দোকানের লোকগুলো পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়েছে। তারপরই বোঝা গেল ব্যাপারটা। ঝুড়িটা রাখতে গিয়ে ঠেলাঠেলিতে দীপুর একটা গাছের ডাল খানিকটা ভেঙে গেছে! বাবা আর অমলকাকু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসছিলেন, কিন্তু দীপু কাঁদতে লাগলো। কেন তার খেলনা ভেঙে দেওয়া হলো। অমলকাকু বললেন—ঠিক আছে রাস্তায় যেতে যেতে আর একটা ডাল কুড়িয়ে দিলেই তো হবে। কিন্তু দীপু সে কথা শোনে না। সে তো যে-কোন গাছের ডাল নেয় না। এই ডালটা ঠিক ছোটমামার মতন ছিল, এটার কেন হাত ভাঙল, ঠিক এইরকম একটা তার আবার চাই।

বাবা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বড্ড বিরক্ত করছো। ঐ রকম করলে সব কটা ফেলে দেবো। যাও, চুপ করে গাড়িতে বসে থাকো। দীপু গাড়িতে গিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইলো। সারাটা রাস্তা আর কারুর সঙ্গে কথা বললো না।

কলকাতায় ফিরে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। দীপু তার খেলনাগুলো সাজিয়ে রেখেছে নিজের ঘরে। তার স্কুল খুলতে কয়েকদিন দেরি আছে। খেলনার গাছের ডাল, পাথর, রাংতা কাগজ কিংবা পাখির পালক—এই সব কিছুই যেন তার চোখে জ্যান্ত। সে প্রত্যেককে একটা কিছু নাম দিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলে। এদের মধ্যে আছে নানান চেনাশুনো আত্মীয়স্বজন, স্কুলের বন্ধু, জগন্নাথ, নেপোলিয়ান, ভীম, অর্জুন, এই সব। দীপু অনেক সময় আপন মনে এদের সঙ্গে এত জোরে জোরে কথা বলে যে পাশের ঘর থেকে মা পর্যন্ত চমকে ওঠেন।

দুপুরবেলা মা শুনতে পেলেন, দীপু বলছে, বাবা তুমি সিগারেট খাবে?

দেশলাই এনে দেবো? দীপু যেন সত্যিই তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। মা চমকে উঠে এ ঘরে এসে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস? তোর বাবা কোথায়? অফিস থেকে ফিরেছে নাকি? দীপু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ তো বাবা! মা দেখলেন একটা পুরোনো ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেটের জালের ফাঁকে কাগজ পাকিয়ে সিগারেটের মতন আটকে রেখেছে দীপু। সেইটাকে বাবা বলছে।

মা আজ রাগ করলেন না। হাসলেন। তারপর বললেন, তোকে নিয়ে আর পারি না! আচ্ছা, তোর আর কোন্ কোন্ খেলনা কার মতন দেখতে, শুনি তো। দীপু পর পর সব কটা শুনিয়ে গেল। এমনকি সেই ভাঙা ডালটাও সে এখনো ফেলেনি। মা সবচেয়ে বেশী হাসলেন একটা কালো পাথরের নাম সুতপা মাসী শুনে। সুতপা মাসীর গায়ের রং দারুণ ফর্সা। তারপর মা জিজ্ঞেস করলেন, আমার মতন দেখতে কোন্‌টা রে? আমি কোন্‌টা? দীপু মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার মতন দেখতে একটাও পাই না মা। কত খুঁজেছি, তবুও পাই না।

সেদিন বিকেলবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরে গম্ভীরভাবে মাকে বললেন, তোমার দাদা ফোন করেছিলেন, একটা খারাপ খবর আছে। মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? কি হয়েছে? বাবা বললেন, অনন্তপুর থেকে খবর এসেছে, কেষ্টর একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

অনন্তপুর গ্রামেই দীপুরা বেড়াতে গিয়েছিল। আর কেষ্ট হচ্ছে ছোটমামার ডাক নাম। তিনি ঐ গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন।

মা চোখ মুখে ভয় ফুটিয়ে বললেন, কি হয়েছে কেষ্টর? বাবা বললেন, কেষ্ট গাছ থেকে পড়ে গেছে। ঐ রোগা চেহারা নিয়ে কেষ্ট জোর করে একটা নারকোল গাছে উঠেছিল। নারকোল গাছে কি আর সে উঠতে পারে! অনেক উঁচু থেকে পড়ে গেছে শুনলাম।

—কোথায় লেগেছে?

—খুব জোর বেঁচে গেছে। মাথায় কিছু হয়নি। কিন্তু একটা হাতে খুব জোর চোট লেগেছে। কালকেই নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।

তারপর এই নিয়ে অনেক কথা হলো। মা সারা সন্ধ্যে চিন্তা করতে লাগলেন তাঁর ভাই সম্পর্কে। শুধু চিন্তা নয়, তাঁর মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইলো। কি রকম যেন একটা অস্বস্তি।

মা এসে একবার দীপুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দীপু তখনও একমনে কথা বলে যাচ্ছে তা খেলনাদের সঙ্গে। সে তখন কর্ণ সেজে যুদ্ধ করছে অর্জুনের সঙ্গে। মা দূর থেকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন। কিছু একটা বলি বলি করেও বললেন না। একবার তাকালেন সেই ভাঙা ডালটার দিকে। তাঁর ভুরু কুঁচকে রইলো অনেকক্ষণ।

এর তিনদিন বাদে, দীপু স্নান করছে দুপুরবেলা, মা রান্নাঘরে, বাড়ির ঝি সব ঘর-দোর মুছছে, এমন সময় দীপুর পড়ার ঘর থেকে দড়াম করে একটা শব্দ হলো।

বাথরুম থেকেই সেই শব্দ শুনতে পেয়ে দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, কি হলো? কি ভাঙলো?

কোনো উত্তর না পেয়ে দীপু ভিজে গায়েই ছুটে এলো নিজের ঘরে। এসে দেখলো, বাড়ির ঝি দু'টুকরো ভাঙা পাথর নিয়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে আছে।

দীপু চিৎকার করে বললো, রাধামাসী তুমি আমার খেলনা ভেঙে ফেললে?

রাধামাসী বললো, কি জানি বাবা! মা বললেন ঘরটা মুছে দিতে। এই পাথরটা মেঝে থেকে টেবিলের ওপর তুলে রাখতে যাচ্ছিলাম, আপনি আপনি কি রকম পড়ে ভেঙে গেল!

দীপু কান্না মেশানো অভিযোগের সঙ্গে বললো আপনি আপনি আবার কিছু পড়ে যায় নাকি! মা রান্নাঘর থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

দীপু বললো, দ্যাখো না মা! ঠাকুরমাকে দু'টুকরো করে দিয়েছে!

মা একটু কেঁপে উঠলেন। তারপর বললেন, এসব আবার কি অলুক্ষণে কথা! চুপ কর।

দীপু তবু বললো, তোমরা কেন আমার সব খেলনা ভেঙে দেবে!

মা হঠাৎ রাধামাসীকে খুব বকতে লাগলেন। একটু দেখে শুনে কাজ করতে পার না? সব সময়ই তো এটা ভাঙছো, সেটা ভাঙছো।

রাধামাসী গজগজ করে উঠে বললো, একটা পাথর তাও আপনা আপনি পড়ে গেল টেবিল থেকে—তাতেও আমার দোষ বলো!

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাম এলো। দীপুর ঠাকুমা হঠাৎ মারা গেছেন। এলাহাবাদে দীপুর জ্যাঠামশাইরা থাকেন। ঠাকুরমাও কয়েকমাস আগে সেখানে গিয়েছিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবা ধপ্ করে বসে পড়লেন। কান্না কান্না গলায় বললেন, সামনের সপ্তাহেই মাকে নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলো না!

এই সময় মা এত জোরে কেঁদে উঠলেন যে বাবা পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তারপর বাবা উঠে এসে মায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি অত ভেঙে পড়ো না। আমার বাক্স গুছিয়ে দাও। আমি আজই রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদ রওনা হবো। মা বাবার হাত চেপে ধরে বললেন, আমার ভয় করছে! আমার ভীষণ ভয় করছে!

বাবা বললেন, ভয় কি! কয়েকটা দিন তুমি একা থাকতে পারবে না?

মা বললেন, সে জন্যে না! তোমার মনে আছে, দীপুর খেলনা সেই গাছের ডালটা যখন ভেঙেছিল, তখন দীপু কি বলেছিল?

—কি বলেছিল?

তোমার মনে নেই? দীপু বলেছিল, ছোটমামার হাত ভেঙে গেল যে, তারপর সত্যি সত্যি কেষ্টর হাত ভাঙলো। তারপর আজই দুপুরে ও যে খেলনাটাকে ঠাকুমা বলে সেটাকে ঝি ভেঙে দিয়েছে।

বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর

বললেন, যাঃ এসব কি বলছো! এ আবার হয় নাকি!

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, সত্যি যে মিলে যাচ্ছে!

বাবা বললেন, মিললেই বা কি হয়েছে! একে বলে কাকতালীয়। এই থেকেই মানুষের কুসংস্কার জন্মায়।

বাবা চলে গেলেন এলাহাবাদ। এই ক'দিন মা দীপুকে সব সময় চোখে চোখে রাখলেন। তাকে আর বেশী খেলতে দেন না। সব সময় নিজের কাছে এনে জোর করে পড়তে বসান।

বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন ক'দিন বাদেই। মাথা ন্যাড়া করেছেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন আরও কয়েকদিন। দুপুরবেলা বাড়িতেই থাকেন। দীপুর ইস্কুল খুলে গেছে।

বাবা ঠাকুরমার একটা ছবি বাঁধিয়ে এনেছেন সেদিন সকালে। ছবিটা তাঁর শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙাবেন। পেরেক ঠোকার জন্য একটা শক্ত কিছু দরকার। বাড়িতে হাতুড়ি-টাতুড়ি নেই! বাবা এ-ঘর সে-ঘর খুঁজতে খুঁজতে দীপুর পড়ার ঘর থেকে একটা বড় পাথর পেয়ে গেলেন। এটাতেই কাজ চলবে।

বাবা পেরেকটা ঠুকছেন, এমন সময় মা দৌড়ে এসে বললেন, একি, তুমি একি করছো! ওটা রেখে দাও! বাবা বুঝতে না জিজ্ঞেস করলেন কেন কি হয়েছে?

—তুমি দীপুর খেলনা নিয়েছো!

—তাতে কি হয়েছে? পাথর দিয়ে পেরেক ঠুকতে পারবো না?

—ও খুব ভালোবাসে খেলনাগুলো। এটাকে যে ও অমলকাকু বলে!

পেরেকটা তখন ঠোকা হয়ে গেছে। বাবা বললেন, ঠিক আছে আমি রেখে দিচ্ছি। আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিলেই তো হলো। পাথরতো আর ক্ষয়ে যায়নি!

মা বাবার হাত থেকে পাথরটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর

বললেন, এই দ্যাখো, মাঝখানটা কি রকম খুবলে গেছে!

বাবা বললেন, মাঝখানটায় একটা চলটা উঠে গেছে শুধু। ও দীপু কিছু বুঝতে পারবে না। যাও, পাথরটা রেখে এসো।

মা তবু সেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অনেকদিন অমলের কোনো খবর নেই। এ বাড়িতেও আসে নি।

বাবা বললেন, হুঁ, বেশ কিছুদিন অমলের পাত্তা নেই বটে। আমিও এলাহাবাদে ছিলাম। এসেও খোঁজ নেওয়া হয়নি!

মা বললেন, তুমি এক্ষুনি ফোন করো।

মায়ের গলার আওয়াজটা এমনই অন্যরকম যে বাবা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফোন তুললেন।

—হ্যালো, অমল?

—কে, প্রশান্ত? কি খবর?

—তোর খবর কি? অনেকদিন পাত্তা নেই।

—ক'দিন খুব সর্দি কাশি আর জ্বরে ভুগছিলাম।

—এখন ভালো আছিস?

অমলকাকু সব কথাতেই হাসেন। এবারেও হাসতে হাসতে বললেন, আজ এক্স-রে রিপোর্ট পেলাম। বুকটা একটু জখম হয়েছে ভাই। ডাক্তার বলছে, আমার প্লুরিসি হয়েছে।

মা বাবা দু'জনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ!

টেলিফোন রেখে দিয়েই বাবা একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অমলকাকু তার খুবই প্রিয় বন্ধু। মা তখনও সেই বুকের কাছে চলটা ওঠা পাথরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

বাবা বললেন, তোমার ছেলের এই সাঙ্ঘাতিক খেলা বন্ধ করতেই হবে।

মা বললেন, দীপুর দোষ কি! আমরাই তো খেলনাগুলো ভেঙে দি কিংবা নষ্ট করি।

বাবা বললেন, তা বলে জ্যান্ত মানুষের নাম নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা। একটার পর একটা বিপদ ঘটে যাচ্ছে।

বাবা রেগে গেলে আর কারুর কথা শোনেন না। দীপুর ঘরে ঢুকে তিনি সব পাথরের টুকরো গুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন পেছনের মাঠে। গাছের ডাল, কঞ্চি, ভাঙা ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট এগুলোও ফেলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ

মত বদলে বললেন, এগুলো সব আমি আগুনে পুড়িয়ে দেবো!

দীপু তখন ইস্কুলে। তার সব খেলনা শেষ হয়ে যেতে লাগলো। বাবা তার সব গাছের ডাল আর কঞ্চিগুলো গুঁজে দিতে লাগলেন রান্নাঘরে জ্বলন্ত কয়লার উনুনে।

ভাঙা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটাও যখন উনুনে দিতে যাচ্ছে, তখন মা তাঁর হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, ওটা দিও না, ওটা থাক, ওটা দিও না।

বাবা সে কথা শুনলেন না। জোর করে র‍্যাকেটটা ভরে দিলেন উনুনে।

তক্ষুনি উনুন থেকে একটা আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠলো। আগুনের জিভ ছুঁয়ে দিল বাবার পাঞ্জাবির হাতা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কোনোক্রমে তিনি উনুন থেকে টেনে তুললেন র‍্যাকেটটা।

আগুন বেশী ছড়ায় নি। বাবার হাতটা একটু শুধু ঝলসে গিয়েছিল, বেশী কিছু হয়নি, মলম লাগাতেই সেরে গেছে।

বাবা দীপুর জন্য অনেকগুলো পুতুল ও মূর্তি কিনে দিয়েছেন। যেমন, বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ান, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, সৈন্য, নাবিক, শিকারী, রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী এইসব—অর্থাৎ যাঁরা কেউ এখন বেঁচে নেই।

□
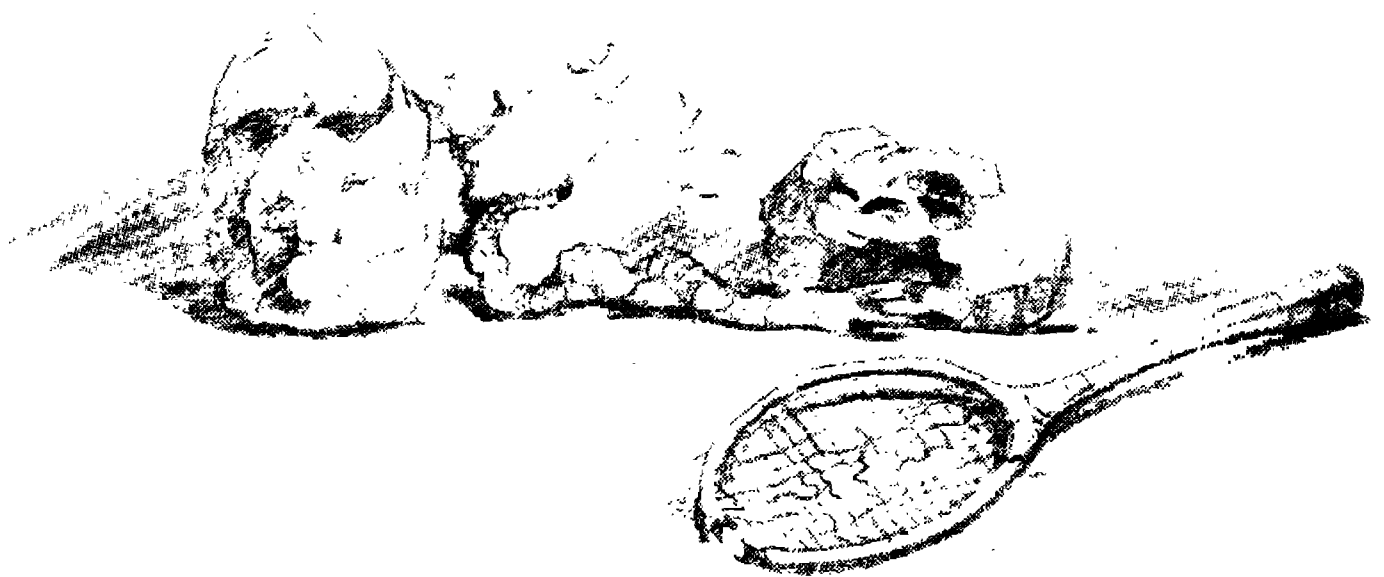
সাধু কালাচাঁদের ফলাও কারবার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ক্লাস টেনের ছেলেরাও সাধু কালাচাঁদকে সমীহ করে চলে।

সারা ক্লাসের অনুরোধে থার্ড পিরিয়ডে সে সাত আট বার বাঘ ডেকেছে। নতুন ভূগোল-স্যার ওঁত পেতে থেকেও ধরতে পারেন নি। শেষ দিকে জি. এন. মণ্ডল—গোপীনাথ মণ্ডল—শূন্যে বেত ঘুরিয়ে বলে গেছেন, "আমার যা কথা সেই কাজ। ওই বাইশ পাতাই উইকলি পরীক্ষার পড়া। আফরিকার জলবায়ু, নদ-নদী, ভূ-পরিচয়, বন্য প্রাণী—যে কোন জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে। তারপর দেখছি বাঘ কোথায় যায়।"

নিষ্পাপ মুখ করে সাধু কালাচাঁদ আগাগোড়া বাঘ ডেকেছে। বলে না দিলে তার ভাবভঙ্গী দেখে কেউ ধরতেই পারবে না।

সে নিজেই বলেছে, আর এক বছরের ভেতর হেড স্যারের সই জাল করে লেট ফি কিংবা ফাইন মকুব করে দিতে পারবে। এখন ছুটির পর বাড়ি ফিরে সে রোজ তিরিশ বার করে জড়িয়ে জড়িয়ে লেখে—নিবারণ চরণ পাকড়াশি। ইংরিজিতে এন. সি. পাকড়াশি।

সারা স্কুলে এভাবে অসময়ে ছুটিছাটার মালিক হয়ে সে এখন নাইন-টেনের স্টুডেন্টদের কাছেও খাতির পায়। দু-পয়সা আসেও তাতে। ফি না বলে কালাচাঁদ বলে ভিজিট। টেনের জন্যে হাফ ছুটি পিছু এক আধুলি। নাইনের বেলায় তিরিশ পয়সা। হিংসুটেরা বলে, সাধু কালাচাঁদের ফলাও কারবার।

কাছাকাছির ভেতর মডেল স্কুল, বি.কে. স্কুল থেকেও কল পায় কালাচাঁদ। ভিজিট নিয়ে দর কষাকষি চলে। রফা হলে স্কুলের খাতায় একখানা আসল

সই দেখে কালাচাঁদ হুবহু সই করে দেয়।

ভিজিটের পয়সায় সাধু কালাচাঁদের বাজারহাট ভালই হয়। এ সব ব্যাপারকে সে বলে—কেস। অসুবিধায় পড়ে যারা আসে তাদের বলে—পেশেন্ট। সময়টা ভালই যাচ্ছিল। ফি দিন টিফিনে কালাচাঁদ ঘুগনি খায়। স্কুল ফেরত আইসক্রিম।

নদীর ঘাট, ডাকবাংলোর মোড়, কাছারি পাড়া—সব জায়গায় মনোহারী দোকানদাররা রাস্তা দিয়ে সাধু কালাচাঁদকে যেতে দেখলে 'কালাচাঁদ বাবু' বলে ডাকে। 'আসুন আসুন' বলে ধরে এনে বসায়। সাধু তাদের এটা-ওটার খদ্দের।

কালাচাঁদ নিজেও পঞ্জিকা দেখে মানি-অর্ডার করে। কখনো অমৃতসর থেকে ঘড়ি আসে। লুধিয়ানা থেকে মাছ ধরার ছিপ। জম্মু থেকে ছুরি ভরে রাখার জন্যে ভেড়ার শিংয়ের খাপ।

এরকম পসারের পর কালাচাঁদ তো আর হেঁটে স্কুলে আসতে পারে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাইকেল রিক্সায় ওঠে। আবার স্কুলের একটু আগে বাদামতলায় এসে নেমে পড়ে। শহরের সবচেয়ে নতুন সাইকেল-রিকশাখানা তার খুব পছন্দ। বেশ সাজানো-গোছানো। সেখানাই সে মাসকাবারি করে ফেলল। নিচু ক্লাসের ছেলেরা বলে, কালাচাঁদদার প্রাইভেট কার। ক্লাসফ্রেণ্ডরা বেটাইমে সেই রিকশায় কালাচাঁদকে যেতে দেখলে বলে, সাধু কলে বেরোলো। নিশ্চয়ই কঠিন কেস।

তা দু'একটা এখন-তখন রুগীকে হাতে নিতে হয় তার। বিশেষ করে শীতকালে। জানুয়ারী মাসে। একটা আসল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সামনে রেখে সে যেকোন স্কুলের হেড স্যারের সইসুদ্ধ নিজ দায়িত্বে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেয়। ভিজিট পুরো পাঁচ টাকা। গত জানুয়ারীতে মডেলে ক্লাস এইটের বিষ্টু আটশোর ভেতর মোট বারো পেয়ে সাধু কালাচাঁদকে কল দিল। দু'দিন পরামর্শের পর পুরো ভিজিট নিয়ে কালাচাঁদ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিল। পাঁচ মাইল দূরে পল্লীমঙ্গল স্কুলে গিয়ে বিষ্টু নাইনে অ্যাডমিশন পেল। প্রোগ্রেস রিপোর্টে ভাল ভাল নম্বর। সাধু কালাচাঁদের হাতের কাজ।

কালাচাঁদ'স ওন সলিউশন। কেরোসিন সহযোগে আমরুলি পাতা। খেতে টকটক। যে-কোন শ্যাওলাধরা পুরনো দেওয়ালে ইটের ফাঁকে গজায়। ভালো করে হাতের চেটোয় ডলে নিয়ে তাতে দু ফোঁটা কেরোসিন ঢেলে নিল কালাচাঁদ। তারপর সেই মিকশ্চার দিয়ে পাকা হাতে প্রোগ্রেস রিপোর্টের নম্বরগুলো তুলে ফেলে নতুন নতুন নম্বর বসিয়ে দিল।

একগাদা খুচরো পেশেন্টের চেয়ে এখন দু'চারটে কঠিন কেস অনেক লাভের। সে রকম রুগী এলে কালাচাঁদ উদাস মুখে বলে, হসপিটালে যাও। কিংবা বলে, চেম্বারে যাও। কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট দেখলে হিংসুটেদের চোখ টাটায়। তাই বুদ্ধি করে কালাচাঁদ তাদের নিজের বাড়ির বারান্দায় যেতে বলে। অনেকটা চেম্বারের মতই। চাটাই বেড়া দিয়ে ঘেরা বারান্দায় সাধুর পড়াশুনার ঘর।

চেম্বারে প্র্যাক্টিস বেড়ে যাওয়ায় কালাচাঁদ একদিন ঘোষণা করল, "আর ভাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস পোষাচ্ছে না। মাথায় কাজ। চাপ পড়ে ভীষণ। যার যা কেস তা নিয়ে হসপিটালে গেলে পারো।"

তবু চেম্বারেই ভিড় বাড়তে লাগল। আশপাশ ধরে ছোট বড় আটটা স্কুল। রুগীর অভাব হওয়ার কথা নয়। খুব সিরিয়াস কেসে সাধু তার নিজের প্রাইভেট কারে পেশেন্ট দেখতে যায়। এমনিতে সকাল-বিকেল পেশেন্ট লেগেই আছে। নদীর ওপারের বেলফুলিয়া হাইস্কুল থেকেও পেশেন্ট আসছে। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের পেশেন্টরা আর তার দেখা পায় না। পেলেও মন পায় না। সাধু দায়সারা গোছের দেখে। একটা হাফ ছুটির কেস তা গুবলেটই হয়ে গেল। ধরা পড়ে পেশেন্ট মার খেয়েও ডাক্তারের নাম কবুল করেনি। সাধুর লাক্।

চেম্বারের রুগীরা ভিজিট ছাড়াও ভেট দেয়। ডট পেন, ডাইরি, চকোলেট বার। প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে সে সব কিছুই নেই।

নিয়তির পরিহাস। সাধু আজ দু'বছর ক্লাশ সেভেনেই আছে। তার হাত

দিয়ে কত রুগী তরে গেল। নিজে তরেনি। কারণ সাধারণ। সই জিনিসটা দু ইঞ্চি লম্বা। সেটা সামলানো যায়। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার আনসার তো অনেকখানি। সেসব সাধু সামলায় কী করে! পড়াশুনো জিনিসটা একেই বিচ্ছিরি, তারপর এই পসার হওয়ায় কালাচাঁদ ওদিকে বিশেষ মন দিতে পারে নি। সাধুর সে-জন্যে কোন আফশোষ নেই।

কালাচাঁদ প্রিয় পেশেন্টদের নিয়ে জেমস কেবিনে মাটন কবিরাজি খাচ্ছিল। পেশেন্টরাই খাওয়াচ্ছিল। সাধু খেতে খেতে হাফিয়ে উঠল। ভারিক্কি আরামী চালে বলল, "আমার আর পড়াশুনোটা হল না রে।"

মডেল স্কুলের সিক্সের সতীনাথ তার এখন খুব ন্যাওটা। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। অনেক খাতির করে সতীনাথকে বলে কম্পাউণ্ডারবাবু। কারণ সতীনাথ নিজেই শুধু কালাচাঁদকে একা পেলে ডাক্তারবাবু বলে ডাকে। সে-কথা চাউর হয়ে যায়। সাধুরও আসকারা ছিল তাতে। সতীনাথ হাসি-হাসি মুখে বলল, "ডাক্তার, তোমার চেম্বারের ঝক্কি আগে সামলাও। তারপর ওই এলেবেলে পড়াশুনো আপনা আপনিই হয়ে যাবে।"

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই!!

সাধুর এই শ্লোকে শোক মেশানো ছিল। তার ক্লাস ফ্রেণ্ডরা এখন উঁচুতে উঠে অন্য ঘরে বসে। সতীনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "যে জন্যে লেখা-পড়া তার আর বাকি কী। তুমি তো গাড়ি-ঘোড়া চড়েই থাক।"

"তা যা বলেছিস।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু আগে কাটা কার্তিকরাঙী ধান বোঝাই দিয়ে নৌকা করে আবাদ থেকে ফিরলেন। ভুলো মানুষ। মনটা খুশী ছিল। খেতে বসে ছেলেকে বললেন, "কোন ক্লাসে পড়িস?"

"সেভেনে।"

কেমন খটকা লাগল। "গতবারও ধান নিয়ে ফিরে শুনেছিলাম, সেভেনে। এবারও সেভেন? কী ব্যাপার?"

সাধুর মা পরিবেশন করছিলেন। বললেন, "আজকালকার মাস্টারমশাই সব আগের মত তেমন কি আছেন। সব পাশ টেনে চলেন। কালাচাঁদকে দেখবার তো কেউ নেই। তাই আর উঠতে পারেনি।"

"তোমায় সে কথা বুঝিয়েছে বুঝি!"

অঘোরবাবু গম্ভীর হয়ে খাওয়া শেষ করলেন। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে কালাচাঁদকে প্রশ্ন করে করে সব জেনে তো তাঁর চক্ষুঃস্থির। এক বছর নয়, অনেকদিন হল কালাচাঁদ ক্লাস সেভেনে।

সাধুর চেম্বারে ঢুকে তিন শিশি সলিউশন পেলেন। গন্ধ শুঁকে কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকার মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর একখানা খাতা খুলে দেখেন—অসংখ্য সই।

আধঘণ্টা মেরেও কালাচাঁদের মুখ থেকে কিছু বের করতে পারলেন না।

কালাচাঁদ মার খায় আর সলিউশনের জন্যে মনে মনে হায় হায় করে ওঠে। গাদা গাদা গার্জেন আর ক্লাশ-টিচারের নমুনা সই-সুদ্ধ খাতাখানাও

অঘোরবাবু ছিঁড়ে কুটি কুটি করলেন। কালাচাঁদ চোখ মোছে আর ভাবে—গেল! গেল!! এতবড় পসারটা মাঠে মারা গেল। বাবা যদি কিছু বোঝে।

"উইক্‌লি পরীক্ষা কবে?"

"শুক্রবার।"

"কী পরীক্ষা?"

"ভূগোল।"

"বই নিয়ে আয়। কতদূর পড়া দেখি। মাঝে তো দু'টো দিন মোটে—"

দেখাল কালাচাঁদ। বইখানা কালাচাঁদের হাতে দিয়ে বললেন, "আজ সারারাত ধরে এই বাইশ পাতা মুখস্ত করবে। ঘুমোবে না। কাল সকালে পড়া ধরব।"

কালাচাঁদ পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে সারা পাড়া ঘুমিয়ে পড়ল। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সবজির গরুর গাড়ি যায় ক্যাঁচ কোঁচ। দু' চাকার মাঝে নীচের হেরিকেনটা ঘটাং ঘটাং দুলছে।

টেবিল থেকে উঠে কালাচাঁদ অন্ধকার মাঠে নামল। হাতড়াতে হাতড়াতে দুটো শিশি পেল। তিন নম্বরটা যে কোথায় পড়ে আছে অন্ধকারে! নমুনা সইয়ের খাতার পেছনের আধখানা পেল মাঠের শেষে একদম রাস্তার গায়ে।

সবকিছু তুলে এনে টেবিলে রাখল সাধু। দু' শিশির কোনোটাতেই সলিউশনের ছিটেফোঁটাও নেই। ছেঁড়া খাতার শেষ বারোপাতায় পল্লীমঙ্গল, মডেল আর বি.কে. স্কুলের ক্লাশ-টিচারদের, কিছু গার্জেনদের সই আস্ত পাওয়া গেল। অথচ এই খাতা আগে গার্জেনদের সইয়ে গিজ গিজ করত।

খাতার অবস্থা দেখে কালাচাঁদের চোখে জল এসে গেল। বাবা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশুতি রাত। খাতার পাশেই ভূগোল বই। আফ্রিকার নদ-নদী চ্যাপ্টারে লাল কালির দাগ। সেখানে কালাচাঁদের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল। কালাচাঁদ জানে পরের চ্যাপ্টারে আফ্রিকার পর্বতমালা। কিলিমানজারো না কীসব পর্বতের নাম। তার পায়ের কাছে মরুভূমি।

ডান হাতে মাথা রেখে খাতার ওপরেই সাধু ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে দেখে তাজ্জব ব্যাপার। বিশ্বাসই হতে চায় না। এ সে কোথায় এসেছে!

উঁচু মালভূমি-মত জায়গায় পাহাড়ী পথের ওপর লোকালয়। গোলপাতার ঘর। কাঠের দেওয়ালে কয়েকখানা বর্শা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। একটা বড় জয়ঢাক পেটাচ্ছে একজন আফ্রিকান। তার কোমর থেকে কলাপাতার ঝালর ঝুলছে। নীচের উপত্যকা দেখা যায়। সেখানে শীতকালের শান্ত একটা নদী জল নিয়ে পড়ে আছে। তার তীর ধরে তিনটে সিংহী তাদের ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খেলছে। নীচে দূরে খানিকটা জায়গায় এক পোঁচ সবুজ ঝকঝক করে উঠল সকালবেলার রোদে। কালাচাঁদ দেখেই বুঝল—ওটা মরুদ্যান। নদীর পারে জার্সি গায়ে একটা জেব্রা এসে হাজির হতেই সিংহের বাচ্চাগুলো তার পায়ের ফাঁকে গলে যেতে লাগল। তিন সিংহী ঠায় বসে তা দেখতে লাগল।

কালাচাঁদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ফিরে তাকাতেই চিনতে পারল। আরে! এতো সেই কিলিমানজারো পর্বত। তার সরল ভূজ্ঞানে ন'য়ের পৃষ্ঠায় হুবহু এই ছবি আছে।

কিন্তু সে তো কালাচাঁদ। সে এখানে আসে কী করে? এবারে নিজের দিকে চোখ পড়ল। সে উঁচু টিবিতে বসে আছে। তার ডান হাতের কাছে একখানা বর্শা মাটিতে গাঁথা। কোমরে কলাপাতার ঝালর। দু'হাতের দুই কনুইয়ের পায়না দুটো সরে গেছে। মাথায় কিলিমানজারো পাহাড়ের কোন গাছের পাতার মুকুট হবে। গলায় পাথুরে মালা। বেশ ওজন আছে।

দূরে নদীর গায়ে একখানা লম্বা ছিপ এসে ভিড়ল। আসলে আফ্রিকান মাঝি ছিপখানা তীরে ভিড়িয়ে দিয়ে জলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজন যাত্রী লাফিয়ে ডাঙায় উঠল। এদিকেই আসছে।

কাছে আসতেই কালাচাঁদ চিনতে পারল।

প্রথম জন অঘোর প্রামাণিক। পায়ে রবারের জুতো বালিতে ভরে গেছে। হাফসার্ট। মাথায় একটা আঁব।

দ্বিতীয়জন নিবারণ চরণ পাকড়াশি। পায়ে খোলা কাবলি জুতো। বুক পকেটে খাতা দেখার লাল ডটপেন। হাতে ছাতা।

তৃতীয়জন খালি পায়ে এসেছে। বিশ্বনাথ।

তিনজনই পরিশ্রান্ত। একটা পাথরে বসে হাপাচ্ছিল সবাই। অঘোর প্রামাণিক রবারের জুতো উল্টে বালি বের করছিলেন। এমন সময় জয়ঢাক থামল।

তিনজনেই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

"আপনি বাংলা জানেন?"

"'সব জানতে হয়।" বলতে বলতে সাধু দেখল, কেউ তাকে চিনতে পারে নি।

তিনজনই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে জয়ধ্বনি দিল। জয় সাধু কিলিমানজারোর জয়! জয় বাবা কিলিমানজারো!! জয়!!

কালাচাঁদের খটকা লাগল। সে আবার পেছন ফিরে কিলিমানজারো পাহাড়টাকে দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, তা মন্দ না! কালাচাঁদ এক লাফে

কিলিমানজারো। কালাচাঁদের আফ্রিকান বাংলা হয়তো কিলিমানজারো। যে ভাবেই সে এখানে আসুক, হয়ত ভাল পসার জমে যেতে পারে। একবার পসার হয়ে গেলে সে সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন সবাইকে দেখিয়ে দেবে—সে আসলে কী। তার আগে নয়।

অঘোর প্রামাণিক বললেন, "আমরা এশিয়ার খুলনা থেকে আসছি।"

"সে তো দেখেই বুঝেছি। কোন পথে এলেন? ভৈরব দিয়ে?"

ওঁরা আশ্চর্য হলেন, "আপনি সব জানেন?"

"জানতে হয়।"

বিশ্বনাথ বলল, "ভৈরব দিয়ে রূপসা নদীতে পড়লাম। তারপর মিপসা। বঙ্গোপসাগর। ভারত মহাসাগর। ভূমধ্যসাগর। আমাজানের মোহনায় নৌকাডুবির জোগাড়। কঙ্গো নদী অনেক ঠাণ্ডা। শুধু কুমিরের উপদ্রব। নীল নদে ঢুকে জোয়ার পেয়েই পাল খাটিয়ে নিলাম। তিন জোয়ারের পথ পেরিয়ে আপনার ডেরায় এসে হাজির হলাম।"

"পথে ঢেউ পেয়েছিলেন?"

নিবারণ চরণ পাকড়াশি বললেন, "প্রবল। ভারত মহাসাগরে অঘোর বাবু বমি করে একাকার করলেন। আমার পকেটে সব সময় মুখশুদ্ধি থাকে। তাই দু'বার খাওয়ালাম। তারপর আর বমি করেননি।"

"আপনি তো জুবিলি স্কুলের হেডমাস্টার?"

এক কথায় এন. সি. পাকড়াশির চোখ কপালে উঠল। "জয় বাবা কিলিমানজারো! আপনার দেখছি কিছু অজানা নয়।"

"ডট পেনটা দিন। কাগজ আছে?"

এন. সি. পাকড়াশি ডটপেনের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বের করে দিলেন।

"এই তো আপনার সিগনেচার?"

"আশ্চর্য! আপনি আসলে কে বাবা? আপনি জাতিস্মর না যোগী? জয়!

সাধু কিলিমিনজারোর জয়!!”

“সেই জি. এন. মণ্ডল ভূগোল পড়াচ্ছেন?”

“হ্যাঁ বাবা।”

“ওঁকে ড্রিলের ক্লাশে দিন।”

“কিন্তু উনি যে জিওগ্রাফি ট্রেন্ড টিচার—”

“ড্রিলে দিয়ে দেখুন না। ভাল পড়াবেন। এশিয়া থেকে মার্চ করে আফ্রিকায় চলে আসতে পারবেন। বেশ মজবুত স্বাস্থ্য। কী? প্রস্তাবটা খারাপ?”

“না না। আপনি যখন বলেছেন। এরপর আর কী কথা—” বিশ্বনাথ যেন খুশীই হল। এ হল গিয়ে বাবা কিলিমানজারোর নির্দেশ।

এন. সি. পাকড়াশি অধীর হয়ে বললেন, “একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি।”

“ভিজিট এনেছেন?”

একখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিতে কালাচাঁদ আপত্তি করল। “অত তো নয়।”

“নিন না। এ তো স্কুল ফাণ্ডের টাকা। পেশেণ্ট হল গিয়ে স্বয়ং জুবিলি স্কুল। গতবছর আশপাশের স্কুল থেকে কয়েকটি ভাল ছেলে ভাল-ভাল নম্বর সুদ্ধ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আমার স্কুলে এসে ভর্তি হয়। এবার টেস্টে তারা সবাই ঢেড়িয়েছে। এদের যদি সেন্ট-আপ করি তাহলে স্কুল ফাইন্যালে ফেল করে ওরা স্কুলের অ্যাফিলিয়েশনের দরকারী পাশের সংখ্যা নষ্ট করে দিতে পারে। ওদের ফাইন্যাল দিতে না পাঠালে ছাত্রসংখ্যা আবার কম হয়ে যায়। উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কী করব বাবা?”

বুনো মহিষের শিংয়ের ভেতর নোটখানা গুঁজে রেখে কালাচাঁদ বলল, “সেণ্ট আপ করুন। ঢালাওভাবে টুকতে দিন।”

“তা কী করে দেব? ওদের তো অন্য স্কুলে সিট পড়বে।”

“তা তো পড়বে।”

“কিন্তু ওই হেড মাস্টার-মশাই গোঁয়ার আছেন। টোকাটুকিতে বিশ্বাস নেই

একদম। একথা বলতে গেলে মারতে আসবেন।”

“খুচরো দশ টাকার নোট আছে?”

এন. সি. পাকড়াশি একখানা এগিয়ে দিলেন।

সে নোটখানাও মহিষের সিংয়ের ভেতর গুঁজে রেখে কালাচাঁদ একটা শিশি এগিয়ে দিল, “সাধু কিলিমানজারো’স ওন সলিউশন। জোর করে ধরে খাইয়ে দেবেন দু’ দাগ। সব কথা শুনবে। গোঁয়ারতুমি আর থাকবে না।”

“খাওয়াতে গেলে যদি কামড়ে দেয়?”

“জুবিলি স্কুলের জন্যে এতটা এলেন। ফিরে গিয়ে আর এটুকু করতে পারবেন না?”

এন. সি. পাকড়াশি লজ্জায় সলিউশনের শিশিটা ঝুল পকেটে ভরে ফেললেন।

অঘোর প্রামাণিক বললেন, “আমার একমাত্র ছেলে কালাচাঁদকে পাচ্ছি না। তার মা কান্নাকাটি করে অন্নজল ত্যাগ করেছেন।”

“তাকে আর পাবেন না। সাধু হয়ে গেছে।”

“আমার পরিবারেরও তাই সন্দেহ। একবার চোখে দেখা যায় না? নইলে ওর মা আত্মঘাতী হবেন।”

“বাড়ি গিয়ে সকালবেলা পূবমুখী হয়ে বসবেন আর একলক্ষ আট হাজার বার জপ করুন।”

“কী জপ করব বাবা?”

“আর ঠ্যাঙাব না। আর ঠ্যাঙাব না।”

“আপনি কী করে জানলেন বাবা?” অঘোর একদম আশ্চর্য। সত্যি, মারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। কার মাথা ঠিক থাকে বলুন। একই ক্লাশে পাকাপাকি রয়ে গেছে— বাড়ি ফিরেই জপে বসব। যদি ফিরে আসে কালাচাঁদ।”

“প্রাণমন দিয়ে জপলে কী না হয়।”

“আপনি ত্রিকালদর্শী বাবা কিলিমানজারো।”

“সবই দেখতে হয় আমাদের। তোমার ব্যাপার কী খোকা?”

বিশ্বনাথ হাঁটি-হাঁটি পা করে সামনে এগিয়ে এল। "আমি লেখাপড়া বিলকুল ভুলে যাচ্ছি বাবা। রোজ একটু একটু করে—"

"কী রকম?"

"কাল পর্যন্তও মনে ছিল— ছোট হাতের 'টি' লেখে কী করে। আজ এই সকাল বেলার ভেতরেই বড় হাতের ইউ লেখা আধখানা ভুলে গেছি। আর মোটে পাঁচটি হরফ ভুলে যেতে বাকী আছে। তারপর সব সাফ।"

"মনে মনে সেন্টেন্স করতে পারো?"

"তা এখনো পারি। কিন্তু লিখব কী করে? হরফগুলোই মন থেকে মুছে যাচ্ছে রোজ।" বিশ্বনাথ কেঁদেই উঠল। "এখন সারাদিন বই খুলে বসে থাকি। কিন্তু পড়তে পারি না। অর্ধেকের ওপর হরফ যে মনে নেই।"

"এ তো কঠিন অসুখ। এরপর বাক্য গঠনও ভুলে যাবে। শেষে নিজের নামও হারিয়ে যাবে। নিজেকেই চিনতে পারবে না একদিন। সনাক্ত করতে লোক লাগবে।"

বিশ্বনাথ কালাচাঁদের ঢিবির সামনে বসে পড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। দু'হাত ওপরে তুলে বলল, "একটা পথ দেখান সাধু কিলিমানজারো। না হলে আমি এখান থেকে উঠব না।"

"আপনারা দু'জন ওই জয় ঢাকটার ওপাশে গিয়ে বসুন। কঠিন কেস। ভালো করে দেখতে হবে।"

নিবারণ আর অঘোর সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "উনি যদি কিছু বলেন—"

উনি মানে সেই আফ্রিকান ঢাকী। বর্শা হাতে সেই জয়ঢাকটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ এদিকে। তার দৃষ্টির খানিকটা কিলিমানজারো পাহাড়ের ডগায়। ডোরা কাটা জেব্রাটার সঙ্গে খেলতে-খেলতে সিংহীদের দুই বাচ্চা পাহাড়ী পথ ধরে এদিকেই অনেকটা এসে পড়েছে। দূরে নদীতে আরেকখানা ছিপ এসে ভিড়ল। আফ্রিকান পেশেন্টরা দল বেঁধে আসতে শুরু করেছে সবে। বর্ষাকালে জলের ঢল পাহাড় ধসিয়ে নামে অনেক সময়। তাই কিলিমানজারোর

গায়ের অনেক জায়গায় পাথুরে খোসা উঠে গিয়ে লালচে বুক বেরিয়ে পড়েছে। সেখানটায় রোদ পড়ে দগদগ করছে।

ওরা দু'জন সরে যেতে কালাচাঁদ বিশ্বনাথের দিকে তাকাল। "কখনো কোন ভিজিটে ভাগ বসিয়েছিলে?"

"কোথায়? মনে পড়ে না তো।"

"ভালো করে স্মরণ করো।"

"হ্যাঁ বাবা। কালাচাঁদের ভিজিটে। ও নিজেও দিত আমাকে—"

"কোন কালচাঁদ? অঘোরবাবুর হারানো ছেলে?"

"হ্যাঁ বাবা। মারের চোটে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা—"

"ফিরলে ভাল ব্যবহার করবে?"

"করতেই হবে। নইলে নিজেও তো একদিন হারিয়ে যাব। চিনতে পারব না। চিনিয়ে দিতে লোক লাগবে বললেন—"

"দায়ে পড়ে নয়—নিজের থেকেই ভাল ব্যবহার করবে তো?"

"আমার সে অভ্যেস নেই বাবা। ক্লাশ থ্রি থেকেই সবাই আমায় ভয় করে। আমি কেড়ে খেয়ে বড় হচ্ছি—"

অভ্যেসটা না ছাড়লে তো নিজের নাম ভুলে যাবে এক হপ্তার ভেতর।"

"আমায় বাঁচান সাধু কিলিমানজারো—এই আপনার ভিজিট—"

বিশ্বনাথ তার হাত ধরতেই ঘুম ভেঙে গেল কালাচাঁদের। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল, রোদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। কোথায় কিলিমানজারো পাহাড়! ঘুমের ভেতর মুখ থেকে লালা পড়ে সরল ভূজ্ঞানের একখানা পাতা পুরো ভিজে গেছে।

বাবা অঘোর প্রামাণিক লোকজন জোগাড় করে তখন উঠোনে ধান ঝাড়ানো শুরু করেছেন।

□

গন্ধটা সন্দেহজনক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকী। তখন এতসব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছ-গাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদা মশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায়সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক নাগাড়ে তিন-চার কিংবা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন'জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে-দোরে ঢুকতে দেবেন না।" আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত গিন্নী এসে দিদিমাকে বলে গেলেন, "নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক খোলা রাখবেন। ছেলে-পুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভাল নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন, দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেন'খন।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধবয়সী বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনো-মোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি ? কই দেখি তাকে !"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মিচকি হাসি হেসে বললেন, "ওদের ওরকমই ধারা। ঝি-টার নাম কি বলুন তো ?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো।"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায় ? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোন্‌টা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।"

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

সে মাথা নিচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।" কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খট্‌কা ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন

মাষ্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামিয়ে মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলে-বেলে খেলা দেখাতেন।

দড়ি কাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ টর্চের আলো ফেলবেন না... ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ ওই হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা— ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসার ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেও

সেরকম হল না। দর্শকেরা কে গিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসার ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ ভাল্লুক নই.. ইত্যাদি! সে সময় হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল, এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসার ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিসিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকেরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ, কী হয়েছে! এবং তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে

সাপের জিবের মতো আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হল্‌কা বেরোয়। দর্শকেরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে চার পাঁচ সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন। স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হল্‌কা বেরোয়।

তখনকার মফঃস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা-টেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসার ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এ'রকম আর দেখিনি।"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন!"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, "তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য।"

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদা মশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ, আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশায়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবৎ আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরা এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশন মাষ্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশী করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এসব কী বলছেন মাসীমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহনীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ঐ দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোন লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই-পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশন মাষ্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে কে আছিস।" বলামাত্র একটা ছোকরা মতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?" সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাইফরমাস খেটে দিয়ে যায় আর কি। খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়তেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহিগলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপ চাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাষ্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাষ্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেন নি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনা সুরও কেউ টের পায়নি।"

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছে থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসী তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মামীরা নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসী রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, "আয় রে।"

অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসি মুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজোমামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশী লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত,

"কে খেলবি আয়।" অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খেলা খুব জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরো একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে।" রেফারী গুনে দেখলেন, না, এগারজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারীই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের টিমে চার পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।"

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারী, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর কাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গুনে দেখুন।" রেফারী গুনে দেখে আহম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাটলীসট্ টেন এক্সট্রা মেন ইন দিস টিম।"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল্ পিল্ করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?"

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়ছে। কিন্তু

কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে মেলার হাল চাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?"

স্টেশন মাষ্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।"

"কে? কাদের কথা বলছো?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ্য করতেন, আর বলতেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ্ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপন মনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবা মশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি! অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশী উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধার বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, "এ ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায় মাঠে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর

কথাবার্তা।" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় মাঠে বা হাটে-বাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না, ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশী ছিল। সন্ধ্যের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে ধর্মদাস মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাষ্টার মশাইকে তো আর বলতে পারেন না— আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতর বাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই শুনছিস ?"

অমনি একটা সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছো ?"

"আমি একটু বাথরুমে যাবো, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াবো কেন ? তোমার কিসের ভয় ?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বললেন, "ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কিসের ভয় বললে না ?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।" ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছো তোমরা।"

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতের মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিম সিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাটা দেয় যদি। এমন

সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ঐ কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

□

ফকরা নিশি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়মামা বললেন, "তপু, তুই ঠিক চিনে যেতে পারবি তো?"

"হ্যাঁ মামা, পারব। আমি তো বড় হয়ে গেছি।"

বড়মামা হাসলেন। তপুর এই স্বভাব। একটু পাকা-পাকা কথা বলে।

গরমে কিংবা পুজোর ছুটিতে তপুকে রেখে আসে গোপাল। ছুটি ফুরোলে তপুর কাকা আবার দিয়ে যায়। এবারে গোপালের শরীর ভাল না। বড়মামা নিজেও যেতে পারতেন। কিন্তু এত বড় সংসার জমি-জমা গরুবাছুর হাট-বাজার বলতে তিনিই সব। অথচ ছুটি পড়ে গেছে। ছেলের আর একদম মন টিকছে না। সঙ্গে লোক দেবারও কোনো সুরাহা করতে পারছেন না—কী যে করেন। তপুকে দেখলেই বুঝতে পারেন মায়ের জন্য তার ভারী কষ্ট হচ্ছে। ওর যাওয়া দরকার। তপু তখনই সাহস করে বলে ফেলেছে, "এই তো সনকান্দা পার হলে গরিপরদির মঠ। আমি আর মামা মাঠে নেমে ঠিক মঠ-বরাবর হাঁটব। তারপর দেখতে পাব সেই বাঁশের লম্বা সাঁকো। সাঁকো পার হলেই তো সাধুরচরের মন্দির। তারপর নদীর পারে-পারে হাটখোলা চলে যাব।"

তবু বড়মামা বললেন, "পাটক্ষেত সব বড় হয়ে গেছে। সাবধানে যাবি। কেউ কিছু দিলে খাবি না। হাটখোলা গেলে গাঁয়ের কেউ-না-কেউ থাকবে। ঠিক বাড়ি চলে যেতে পারবি।"

মামার অনুমতি পেয়ে সে খুব সকাল-সকাল দুটো সেদ্ধভাত, মাছভাজা খেয়ে বের হয়ে পড়ল। হাতে ছোট টিনের বাক্স, হাফ-হাতা শার্ট গায়ে, খাকি প্যান্ট পরনে। ছোট ছেলেটা গাঁয়ের পথে মাঠে নেমে যাবার আগে

বড়োদের মতো চালে ঠাকুর ঘরের দরজায় টিপটিপ মাথা ঠুকল দুবার। যা সব ভয়। যেমন, সে ভয় পায় নিশির ডাককে, ভয় পায় গরিপরদির মাঠে বড় একটা অশত্থ গাছকে। এবং মানুষের চেয়ে এই সব অদৃশ্য আত্মাদের সম্পর্কেই তার ভয় বেশী। যে কেউ তাকে ভেড়া ছাগল গরু বাছুর বানিয়ে ফেলতে পারে। যেমন খুশি তারা বগলে করে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে জলে ডুবিয়ে মারতে পারে। অথবা সারা জীবন সে একটা গাছের নীচে পাথর হয়ে থাকবে। মা বাবা টেরও পাবে না, তাদের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটা বাড়ির পাশেই গাছের নীচে পাথর হয়ে আছে। এমন সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা মাঠে নামতে-না-নামতেই পেয়ে বসল। কেমন একটা ভয়-ভয়। একা একা কখনও সে এতদূর রাস্তা হেঁটে যায়নি। অপরিচিত গ্রামের মাঠে পড়ে সে খুব সতর্ক হয়ে গেল!

আকাশে আবছা মেঘের ছায়া। কোথাও দূরে দিগন্তবিস্তৃত আউসের জমি। ধানক্ষেতে মাথলা মাথায় নিড়েন দিচ্ছে চাষীরা। তারা সমস্বরে গান গাইছিল। সবুজ মাঠ এবং চাষীদের এই প্রিয় গান তাকে বেশ ভালই রেখেছে। এখন সে যেন পাখা থাকলে প্রায় মায়ের কাছে উড়ে যেতে পারত। মা বাদে পৃথিবীর মানুষের আর কী থাকে, তা সে তখনও জানে না। ছোট ভাই পিলু তো ঠিক পুকুর-পাড়ে সকাল-বিকেল দাঁড়িয়ে আছে—দাদাকে দূরের মাঠে দেখেই দৌড়বে বাড়িতে, মা, দাদা আসছে, গোপালদা আসছে। এবার সঙ্গে গোপালদা নেই। সে একা। বাবা-কাকারা ভীষণ অবাক হয়ে যাবে, এতটুকু ছেলে ঠিক চার ক্রোশ পথ চিনে চলে এসেছে। বলবে, তোর সাহস তো কম নয়। ভয় করল না?

একটুও না। এবং সে যত হাঁটছে, তত নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। আম জাম অথবা জামরুল গাছটায় সে গিয়ে ঠিক পেয়ে যাবে থোকা থোকা ফল। গরমের ছুটিটা তার ভারী মনোরম।

তপু যতটা পারছে পাটের জমি সব এড়িয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে গেলে

বড় গোলকধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। পথ খুঁজে বের করা যায় না। কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। জমির পর জমি কতদূরে চলে গেছে। শুধু পাটের জমি। সবুজ মেঘের মতো অথবা নীল ঢেউয়ের মতো। ওরা আছড়ে পড়ছে আকাশের নীচে। সে যেখানে যত ধানের ক্ষেত পাচ্ছে, অথবা তরমুজের ক্ষেত, তার পাশে পাশে হাঁটছে। কখনও দূরের মঠ দেখা যাচ্ছে, কখনও দেখা যাচ্ছে না। পাটগাছগুলো সহসা আড়াল করে ফেলছে মঠটাকে।

পাটগাছগুলোর পাশে পাশে সরু সব আল। ঘাস সবুজ। কতরকমের পোকা উড়ছে। গুমোট গরম। তাকে কিছুটা পথ বেশী হাঁটতে হচ্ছে, তবু কিছুতেই ক্ষেতের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে না। ঢুকে গেলেই পাটগাছগুলো তাকে ঢেকে ফেলবে। প্রায় নদীর জলে ডুবে যাবার মতো। তখন সুযোগ বুঝে ওরা খুঁজে বেড়াবে তাকে। সে নিশির ডাক শুনতে পাবে। "তপু নাকি রে! কোথায় যাচ্ছিস, ঠিক যাচ্ছিস না। আমার সঙ্গে আয়। আমি তোকে বাড়ি পৌঁছে দেব।" তাকে লোভ দেখিয়ে কাছে নিয়ে যাবে, সেই যে ছোট হাত অথবা কঙ্কাল শরীরে ছুঁইয়ে দিলেই ছাগল গরু ভেড়া। ওকে ভেড়া বানিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করে দিলেও কিছু করার থাকবে না। কে জানে, তার বাবা-কাকা ভেড়াটা কিনে নিয়ে তারপর...না, তারপর সে আর ভাবতে পারে না, শরীর তার ভয়ে কেমন হিম হয়ে আসছিল। সে লোকজন দেখলে, এমন কী গরু ছাগল দেখলেও, বিশ্বাস করছে না। বেশ ঘাস খাচ্ছে, আসলে ওগুলোর রূপ হয়ত অন্যরকম। সব চর এরা। হ্যাঁ, যাচ্ছে তপু, তোমরা সব নজর রাখো। আর তখনই সে দেখতে পেল, দূরে কোনো মঠ নেই, আকাশের প্রান্তে কোনো ত্রিশূল ভেসে নেই—কেবল জমি আর জমি, পাটের জমি। যেন পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক টপকে না যেতে পারলে সে আর মঠের চূড়ো দেখতে পাবে না। আর তখনই দূরে অনেক দূরে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল। "অঃ তপু কর্তা, কোনখানে যান! ওডা তো পথ না। খাড়ন। আমি আপনেরে নিয়া যামু।"

সে পেছন ফিরে দেখল, হোগলার জঙ্গল থেকে অতিকায় দানবের মতো ভয়ংকর কিছু একটা বার হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে। মানুষ না, অথচ মানুষের মতো কথাবার্তা। সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। দাঁড়িতে মুখ দেখা যায় না। আর সেই কটর কটর মালা-তাবিজের শব্দ। যেন হুড়মুড় করে তার দিকে ধেয়ে আসছে। আতঙ্কে তার গলা-বুক শুকিয়ে আসছে। ধেয়ে আসছে লম্বা তালগাছের মতো একটা ফকির। রাত হলে ওর চোখ ঠিক জ্বলে উঠত দপ করে। দিনের বেলা বলে নিশির সেই প্রবল চোখের আগুন সে দেখতে পাচ্ছে না।

আর যায় কোথায়, সামনে কোনো পথ না পেয়ে পাটগাছের সেই ঘন জঙ্গলের ভেতর সেঁদিয়ে গেল। বগলের টিনের বাক্স ফেলে যত দৌড়ায়, তত পেছনে কে যেন ডাকে, "খাড়ন, আমি আইতাছি। দৌড়ান ক্যান!"

লম্বা-লম্বা পাট, যেন শেষ নেই। আলের ওপর দিয়ে সে দৌড়চ্ছে। গাছ থেকে সব পাতা ঝরছে, হাওয়ায় উড়ছে। গাছের নীচে কোনো আগাছা নেই। শুধু পচা পাটপাতা, আর বৃষ্টির জলে পচা পাটপাতার গন্ধ। সে কোনোরকমে পাটের জমি পার হয়ে গেলে ধানক্ষেত পাবে, এবং দূরের মঠ দেখতে পেলে সে আবার তার সব সাহস ফিরে পাবে। অথচ সে সোজা দৌড়তে পারছে না। সে কেবল ঘুরে ঘুরে মরছে। সে গাছের নীচে নদীর ঢেউয়ের মতো ভেসে যাচ্ছিল। হাঁসফাঁস করছিল গরমে। সবুজ ঘন অন্ধকারে তার চোখ ঘোলা হয়ে উঠছে। তখনও দূরে কেউ যেন ডেকে যাচ্ছে, "কই গ্যালেন, আমি আইতাছি।" সে এবার এলোপাথাড়ি ছুটছে। গাছের জন্য ছুটতে পারছে না। কেমন আটকে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে কখনও। তারপর যখন বুঝতে পারছিল, এ-ভাবে ছুটলে সে আর জীবনেও মঠের চূড়ো দেখতে পাবে না, তখন সে বসে পড়ল। এখন আর কোনো ডাক শুনতে পাচ্ছে না, কেবল কীটপতঙ্গের আওয়াজ, বাতাসে পাটগাছ দুলছে। তার কান্না পাচ্ছিল। এক আশ্চর্য গোলকধাঁধায় সে পড়ে গেছে। তার ওপরে ভ্যাপসা গরমে মরে যাচ্ছিল। জামা খুলে ফেলল,

পায়ের কেড্‌স্ জুতোও। হাঁটতে গেলে লাগছে। সারা শরীর ছিঁড়ে ফুঁড়ে গেছে। কোথায় সে চলে এসেছে, তা ঠিক বুঝতে পারল না।

কখনও সে বসে থাকল গাছের নীচে, কখনও ঘাসের আলে শুয়ে থাকল। সে আর পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, নিশির হাত থেকে তার আর নিস্তার নেই। সবই নিশির খেলা। তখন কপাল ঠুকে সোজা একমুখো হাঁটতে থাকল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে কিছুটা হেঁটে এসেই অবাক। সে এসে গেছে সেই বড় সাঁকোর নীচে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত এখন শুধু ধানের জমি, অনেক পিছনে পড়ে আছে মঠের চুড়ো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর তখনই সাঁকোর নীচে সেই হাঁক—

"কর্তা তবে আইলেন। যাইবেন কই। জানি ঠিক শেষতক আইসা পড়বেন। বইস্যা আছি।" ভুতুড়ে লোকটা সাঁকোর নীচে বসে খুশিতে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।

তপুর সারা শরীর ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। তবু শেষবারের মতো রক্ষা পাবার জন্য সে উল্টোমুখে ছুটতে গিয়ে দেখল সাদা ফ্যাকাশে দুটো হাত ক্রমে এগিয়ে আসছে। "কৈ যান!" ঠিক সাঁকোর মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছে হাত দুটো।

শরীরে আর তার বিন্দুমাত্র সাহস নেই। সুটকেসটা হাত থেকে পড়ে গেল। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। পা অসাড় হয়ে গেল। চোখে সর্ষেফুল দেখছে কেবল। বুঝতে পারছিল, সে মূর্ছা যাবে।

"তপু কর্তা! অঃ তপু কর্তা!"

কতকাল পরে যেন ও টের পাচ্ছে, কেউ তাকে ডাকছে। জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে মুখে। আবার ডাকছে, "অঃ তপু কর্তা, আমি ফক্‌রা। ওঠেন। চোখ খুলেন। আল্লা, এইডা কী হৈল।"

তপু পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

"আমি ফক্‌রা। আপনের মামায় কইল, ফক্‌রা কৈ যাস?"

তপু সেই কিম্ভুতকিমাকার মানুষটাকে দেখে ফের ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছে।

"কইলাম যামু হাটখোলায়।"

তপু মনে মনে বলল, বুঝি, তোমার শয়তানিটা বুঝি। ভালমানুষ সাজতে চাও।

"কইলেন, যাস তো তপুরে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবি। তাড়াতাড়ি যা। হাতে টিনের সুইকেস। রাস্তায় পাইয়া যাবি। ওঠেন। আপনের মায় আমারে চিনে। ডর নাই।"

তপু মার কথা শুনে কেমন সাহস পেয়ে গেল। বলল, "আমি তোমাকে ঠিক ধরে ফেলেছি। তুমি নিশি।"

ওর কথা শুনে ভয়ংকর লোকটা কেমন হাসতে চেষ্টা করল। পারল না। বলল, "মাইনসে কত কথা কয়। বাদ দেন অগো কথা। আমি ফকিরা। ফক্‌রা। আপনার মামার বান্দা লোক।"

তপু এবার আরও জোর পেয়ে গেছে। মামার বান্দা লোক, মামদো ভাই। বড়মামার ভূতের কারবার-টারবার আছে সে জানত না। সে বলল, "তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?"

"চলেন, বাড়ি দিয়া আসি।"

"তুমি যাও। আমি একা যেতে পারব। আমার পিছু নেবে না।"

"রাইত বিরাইতে একা ডরাইবেন।"

তপু বুঝতে পারল, সূর্য অস্ত গেছে। শুধু চারপাশে সবুজ মাঠ। বাঁশের সাঁকোটা উটের মতো মুখ তুলে আছে আকাশের গায়ে। লোকজন সে একটাও দেখতে পাচ্ছে না। দুটো-একটা নক্ষত্র আকাশে ফুটে উঠছে দেখতে পেল। সারা মাঠে আশ্চর্য কীটপতঙ্গের আওয়াজ। মাঠ ভেঙে ক্রোশখানেক পথ হেঁটে গেলে হাটখোলা। সে তবু বলল, "তুমি যাও। তোমার সঙ্গে যাব না।"

"এই দ্যাখেন", বলে সে তার লম্বা কালো আলখেল্লা খুলে ফেলল। গলার সাদা লাল নীল পাথরের মালা খুলে ফেলল। পরনে শুধু লুঙ্গি। খালি

গা। বলল, "আমি ফক্‌রা। ডর নাই, চলেন।"

সে তবু বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রায় কঙ্কালসার ভূতের মতো চেহারা। বুকের হাড় গোনা যায়। সাদা ফ্যাকাশে। একগাল দাড়ি। সুরমা টেনেছে। চোখে। জবাফুলের মতো ড্যাব ড্যাব করছে ঘোলা চোখ দুটো।

ভয়ংকর লোকটা বলল, "মুড়ি খাইবেন। চোখ মুখ কৈ গ্যাছে গিয়া। খান্।"

তপু সরে দাঁড়াল। ছুঁয়ে দিলেই সে কিছু-একটা হয়ে যাবে। নুড়ি পাথর। বগলের থলেতে পুরে নিতে একটুও অসুবিধা হবে না।

এবারে হি-হি করে হাসল ফক্‌রা নিশি। গালে মুড়ি ফেলে মুড়মুড় করে খেল। ছোট্ট নেকড়ায় বাঁধা মুড়ি। হাঁ করে খাচ্ছিল। দু-চারটে দাঁত আছে। বাকী নেই। জিভ নেড়ে নেড়ে খাচ্ছে।

তপুর মনে হল, ফক্‌রার ঠিক আলজিভ নেই। নিশি হলে থাকবে না। সে বলল, "হাঁ কর।"

ফক্‌রা হাঁ করে থাকল।

"তোমার আলজিভ কোথায় ?"

"দ্যাখেন।"

তপু দেখল। খুব সতর্ক থাকছে সে। সে আঙুলে দেখল লোহার আংটি। লোহা ধারণ করলে ভূতটুতের উপদ্রব কম থাকে। কিছুটা সে যেন ফক্‌রাকে বিশ্বাস করতে পারছে।

তখন প্রায় ফোকলা দাঁতে হেসে ফক্‌রা বলল, "পাটালি গুড় আছে। খাইবেন ?"

মুড়ি-পাটালিগুড়ের কথায় তপুর জিভে প্রায় জল এসে গেল। কখন সেই সকালে বের হয়েছে। এতক্ষণ খিদে তেষ্টা কিছু ছিল না। এখন আবার সব পাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বালা করছে! সে তবু বলল, "না খাব না।"

"খান, খাইলে বল পাইবেন।"

সে চিৎকার করে বলল, "না, খাব না।"

ফক্‌রা হাত জোড় ক্‌রে বলল, "ঠিক আছে, আর কমু না।"

তপু এবার গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমার থলেতে কী?"

ফক্‌রা বলল, "মুশকিলাসান আছে, চুমরি গাইয়ের ঝাড়ন আছে। দ্যাখবেন?" বলে সে একটা কালো রঙের মাটির তিনমুখো কুপি বের করল। দু'দিকের দুটো মুখে নেকড়ার সলতে, একটা মুখে কাজল। ভেতরে তেল রাখার আধার। ফক্‌রা সলতে জ্বালিয়ে বলল, "মুশকিলাসান। ভিক্ষা করতে বাইর হৈছি।"

তপু বলল, "থলেতে কী আছে?"

মুশকিল আসানের আলোতে থলে উপুড় করে দেখাল। আবছা মতো সারা মাঠে এখন অন্ধকার। আকাশে আরও সব নক্ষত্র। বাতাস শস্যক্ষেত্রে ঢেউ দিচ্ছে। ফক্‌রা এক-এক করে সব দেখাচ্ছে। কাগজের মোড়কে পাটালিগুড়, মুড়ির পুঁটুলি, দুটো বঁড়শির হুক, ছেঁড়া গামছা। সে গামছা ঝেড়ে বলল, "দ্যাখেন, আর কিছু নাই।"

তপুর সব সংশয় কমে আসছিল। কিন্তু ফক্‌রা নিশি বসে রয়েছে। ওর নীচে কিছু থাকতে পারে। মানুষের হাড়, কঙ্কাল, বাচ্চা ছেলের মুণ্ডু যদি লুকিয়ে রাখে। সে বলল, "তুমি ওঠো।"

ফক্‌রা উঠে দাঁড়াল। বলল, "দ্যাখেন, কিছু নাই।"

তপু বলল, "তুমি বসো।"

ফক্‌রা বসলে আবার বলল তপু, "তুমি ওঠো বসো।"

ফক্‌রা ওঠবোস করতে থাকল। তপু আর কিছু বলছে না। সে একবার ওপরে একবার নীচে তাকাচ্ছে। ভয়ংকর মানুষটা এখন হাঁপাচ্ছে। তাকে ভারী নির্জীব এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নিশিরা হাঁপায় না। ক্লান্ত হয় না।

সে এবার বলল, "হাঁটো।"

ফক্‌রা হাঁটতে থাকল।

"থলে টলে নাও।"

সে তার থলে টলে নিয়ে নিল।

তপু বলল, "মুড়ি দাও খাই।"

ফক্‌রা মুড়ি আর পাটালি গুড় দিল।

মুড়ি খেতে খেতে তপু বলল, "তুমি আগে, আমি পেছনে।"

ফক্‌রা ঠিক আগে আগে কুপির আলোতে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। পোকমাকড়ে কাটতে কতক্ষণ। সময় ভাল না। মুড়ি-গুড় খেয়ে তপুর জলতেষ্টা পেল। বলল, "জল খাব।"

ফক্‌রা বলল, "গাঁয়ে গেলে পানি মিলবে। নালার পানি খাইলে মন্দ হইতে কতক্ষণ।" তপু বুঝল, লোকটা তবে সত্যি ভাল।

ফক্‌রা নিশি আগে। তপু পেছনে। আর ভয় ডর নেই। ফক্‌রা নিশি এখন নানা বায়নাক্কা করছে। বলছে, "বইনদিরে কমু, কী ওঠবোস করাইছে আপনের পোলায়। খাওয়ন দিতে হৈব। পেট ভইরা খামু। কতদিন পেট ভইরা খাই না।"

তপু বলল, "দেখব তুমি কত খেতে পার।"

"কর্তাগো, অনেক খাই।"

এবং অনেক খায় বলে , অথবা পেট ভরে খেতে পাবে জেনে মনের সুখে অন্ধকার মাঠে সে গান জুড়ে দিল।

ফক্‌রা নিশির মুশকিলাসানের কুপি দুলছিল। আলো দিচ্ছিল পথে। ওরা দুজন হেঁটে যাচ্ছিল। লোকটা পেট ভরে শুধু খেতে পাবে বলে গলা ছেড়ে কী জোরে গান গাইছে। তপু বুঝতে পারছিল না, কী এক অজ্ঞাত কারণে মানুষটার জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। চোখ দুটো জলে চিকচিক করছে। সে মানুষটার গা ঘেঁষে এখন হাঁটছে। হাঁটতে ভাল লাগছে।

□

Printed at Beauty Print, 10/8020 Multani Dhanda, Paharganj, New Delhi-55